বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

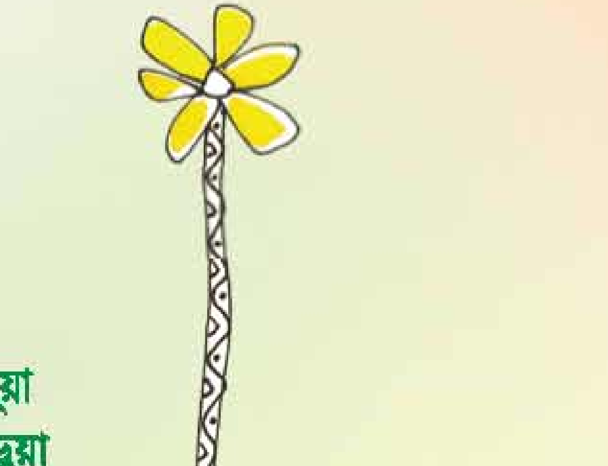

রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া
প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া
শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথের
ড. জগন্নাথ বড়ুয়া

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

চিত্রাঙ্কন
মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন

গ্রাফিক্স
বিপ্লব কুমার দাস

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনর্নির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বুদ্ধবাণীর মূলশিক্ষা নৈতিকতা বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পেয়েছে। শিক্ষার্থীরা মানবিক গুণে গুণান্বিত ও বিকশিত হয়ে ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ ও জন্মভূমি বাংলাদেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসুক-এটাই আমাদের একান্ত কামনা। বুদ্ধের জীবনী, শীল (নৈতিক শিক্ষা), তীর্থস্থান, জাতকের গল্প প্রভৃতি উপদেশমূলক তথ্য এবং পাঠভিত্তিক চিত্র শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন	১–৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	বন্দনা ও নিত্যকর্ম	১০–১৫
তৃতীয় অধ্যায়	পূজা ও দান	১৬–২৪
চতুর্থ অধ্যায়	শ্রামণ্য শীল	২৫–৩১
পঞ্চম অধ্যায়	ত্রিপিটক পরিচিতি : অভিধর্ম পিটক	৩২–৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	কর্ম ও কর্মফল	৩৮–৪৪
সপ্তম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্য	৪৫–৫৫
অষ্টম অধ্যায়	জাতকের শিক্ষা	৫৬–৭০
নবম অধ্যায়	ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন	৭১–৮৫
দশম অধ্যায়	ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান	৮৬–৯৪
একাদশ অধ্যায়	ধর্ম ও স্বদেশপ্রেম	৯৫–১০২
দ্বাদশ অধ্যায়	পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস	১০৩–১০৮

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন

আড়াই হাজার বছর পূর্বের কথা। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যে শাক্যবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। রানির নাম ছিল মহামায়া। মহামায়া এক বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বাপের বাড়ি দেবদহ যাচ্ছিলেন। রানি লুম্বিনী উদ্যানে উপস্থিত হলেন। এমন সময় রানি এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। বহুদিন পর রাজা-রানির মনোবাসনা সিদ্ধ হওয়ায় নবজাত পুত্রের নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। জন্মের সাত দিন পর মাতা মায়াদেবী মারা যান। বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক লালিত-পালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় গৌতম। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করায় অমাত্য ও প্রজাগণ নাম রাখলেন শাক্যসিংহ।

শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েই সাত পা হেঁটে সামনে গেলেন। সাত পায়ের নিচে সাতটি পদ্ম ফুটল। সপ্ত পদ্মে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন– 'জগতে আমিই জ্যেষ্ঠ; আমিই শ্রেষ্ঠ ।'

নবজাত শিশুটি দিন দিন বড় হতে লাগল। তাঁর মাঝে চপলতা ছিল না। সব সময় নির্জনে বসে বসে যেন কী ভাবতেন। একদিন রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থ গৌতমকে সংগে নিয়ে হাল কর্ষণ উৎসবে যান। হালচাষের কারণে মাটির ভিতর হতে অনেক পোকা-মাকড় উঠছিল। ব্যাঙেরা সে পোকা-মাকড় খাচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে রাজকুমারের মনে দুঃখ হলো। নিরীহ প্রাণীর প্রতি রাজকুমারের মন দুঃখে ভরে গেল। মনে করুণা হলো। তখন রাজকুমার

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম

সিদ্ধার্থ জম্বুবৃক্ষের নিচে বসে জীবের দুঃখের কথা ভাবছিলেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম অন্য একদিন বিকেল বেলায় একটি ফুলবাগানে নির্জনে বসে যেন কী ভাবছিলেন। এমন সময় একটি হাঁস তাঁর সামনে এসে পড়ল। হাঁসটির বুকে একটি তীর বিদ্ধ ছিল। সিদ্ধার্থ গৌতম হাঁসের বুক হতে তীরটি খুললেন। হাঁসটিকে সুস্থ করলেন।

এমন সময় সিদ্ধার্থের মামাতো ভাই দেবদত্ত তাঁর সামনে আসল। এসে সিদ্ধার্থ গৌতমকে বলল, 'হে সিদ্ধার্থ। এ হাঁসটি আমার। হাঁসটি আমায় দিয়ে দাও।' তখন সিদ্ধার্থ গৌতম বলল, 'ভাই দেবদত্ত, তুমি! প্রাণহরণকারী, আমি প্রাণদাতা। আমি শাক্যরাজ্য তোমাকে দিতে রাজি আছি। তবুও এ হাঁসটি তোমায় দেব না।' কুমার সিদ্ধার্থ একথা বলে হাঁসটিকে

সিদ্ধার্থ গৌতমের হাতে দেবদত্তের তীরবিদ্ধ আহত হাঁস

আকাশে উড়িয়ে দিলেন। হাঁসটি প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করতে করতে আকাশে উড়ে গেল।

সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে চৌষট্টি রকমের লিপি শিক্ষা করেন। ত্রিবেদসহ নানা শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। অশ্বারোহণ, রথচালনা, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্রসহ ধনুর্বিদ্যায়ও পারদর্শিতা অর্জন করেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম কৈশোরকাল অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেন। তাঁর উনিশ বছর বয়স হলো। তিনি সব সময় নির্জনে বসে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এজন্য রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থ গৌতমকে বিয়ে করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যশোধরা নাম্নী এক ক্ষত্রিয় কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান। কিন্তু এতেও সিদ্ধার্থের মন সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হলো না। জীবের দুঃখ কীভাবে দূর করবেন, নীরবে বসে ভাবতেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম সারথি ছন্দককে সংগে নিয়ে চার দিন নগর ভ্রমণে বের হন। জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত , মৃতদেহ এবং একজন সন্ন্যাসী দেখলেন। জরা–ব্যাধি–মৃত্যুর হাত হতে রক্ষার জন্য সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণই উচিত মনে করলেন। তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনই গৃহত্যাগ করবেন বলে সংকল্প গ্রহণ করেন।

সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। যশোধরা একটি পুত্র প্রসব করেন। পুত্রের নাম রাখা হয় রাহুল। যশোধরা গভীর রাতে নবজাত শিশুকে কোলে নিয়ে সোনার পালঙ্কে ঘুমাচ্ছেন। এ মুহূর্তে সিদ্ধার্থ গৌতম সারথি ছন্দককে ডাকলেন। কন্থক নামক অশ্ব সাজিয়ে আনতে আদেশ দেন। সারথি ছন্দক অশ্ব সাজিয়ে আনল। তখন সিদ্ধার্থ গৌতম যশোধরার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলেন। নবজাত শিশুকে এক পলক দর্শন করে গৃহত্যাগ করলেন।

রাত পোহাল। সিদ্ধার্থ গৌতম ছন্দককে সংগে নিয়ে অনোমা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। অশ্ব হতে নেমে সিদ্ধার্থ গৌতম তলোয়ার দ্বারা মাথার চুল কাটলেন। সেই চুল আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

এরপর সিদ্ধার্থ গৌতম নিজ দেহ হতে সমস্ত রাজকীয় পোশাক খুলে ফেললেন। পোশাকগুলো ছন্দককে দিয়ে বিদায় দিলেন। ছন্দক কপিলাবস্তু নগরে ফিরে আসল। সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগের সংবাদ সকলকে জানাল। নগরবাসী গৃহত্যাগের কথা শুনে কাঁদল।

তারপর সিদ্ধার্থ গৌতম ঋষি আড়ার–কালামের আশ্রমে গেলেন। পরে রাজগৃহের ঋষি রুদ্রক

রামপুত্রের আশ্রমে গমন করেন। উভয় স্থানে কিছুদিন সাধনা করেন। তাঁদের সাধন পথে সাধনার দ্বারা দুঃখ মুক্তি সম্ভব নয় বুঝলেন। তাই এ দুজন ঋষিকে ত্যাগ করে নিজেই সাধনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর সিদ্ধার্থ গৌতম সাধনা করার উদ্দেশ্যে গয়ার অদূরে পাহাড়ের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। অনাহারে শরীরের রক্ত-মাংস শুকিয়ে গেল। শরীর দুর্বল হয়ে গেল। তখন তিনি বুঝলেন সত্যকে লাভ করতে হলে আত্ম-নিগ্রহ এবং ভোগ-বিলাসের পথ ত্যাগ করে মধ্যম পথ অবলম্বন করতে হবে।

দুর্বল দেহ নিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম সেনানী নামক গ্রামে উপস্থিত হলেন। একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় আসন পেতে বসলেন। এমন সময় সেনানী গ্রামের কুলবধূ সুজাতা স্বর্ণ থালায় পায়সান্ন নিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতমের হাতে তুলে দিল। সিদ্ধার্থ গৌতম পায়সান্ন আহার করে নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করেন। তারপর উরুবিল্ল গ্রামে গমন করেন। সেখানে উন্মুক্ত স্থানে একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সে বৃক্ষের নিচে পূর্বমুখী হয়ে

রাজকুমার সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত

২০২৫

কঠোর সাধনারত সিদ্ধার্থ গৌতম

বজ্রাসনে বসলেন। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। তিনি বজ্রাসনে বসে সংকল্প গ্রহণ করলেন—'এ আসনে আমার রক্ত-মাংস শুকিয়ে যাক। শরীর বিনষ্ট হলেও পরম বোধিজ্ঞান লাভ না করে এ আসন ছেড়ে উঠব না।' এমন সময় পাপমতি মার ভীষণ আকৃতি ধারণ করে সিদ্ধার্থের সামনে আসল। সহস্র হস্তে অস্ত্র নিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতমকে আক্রমণ করল। তাঁকে লক্ষ্য করে উত্তপ্ত শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করল। কিন্তু সিদ্ধার্থ গৌতম আসন ছেড়ে উঠলেন না। তখন পাপমতি মার আপন যুবতী কন্যা রতি, আরতি ও তৃষ্ণাকে গৌতম সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করার আদেশ দিল। কিন্তু তিনি সাধনায় স্থির রইলেন।

২০২০

পাপমতি মার ব্যর্থ হয়ে সিদ্ধার্থের সামনে থেকে চলে গেল।

এদিকে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম আকাশে অস্ত যাচ্ছিল। রাত্রির তৃতীয় যামে সিদ্ধার্থ গৌতম সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন। তিনি বুঝলেন তৃষ্ণাই জন্মের কারণ। আবার জন্মই সকল দুঃখের মূল। তৃষ্ণার মূল ছেদন করতে পারলেই পরম সুখ নির্বাণ লাভ সম্ভব। তিনি বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। যে স্থানে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন, সে স্থানটি বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত।

বুদ্ধ হওয়ার পর তিনি চিন্তা করলেন, আমি যে ধর্ম লাভ করেছি তা অতি গভীর ও দুর্বোধ্য। জ্ঞানীগণ ব্যতীত সাধারণ মানুষ এ ধর্ম বুঝবে না। এ কারণে ধর্ম প্রচার করবেন না বলে সংকল্প গ্রহণ করলেন। সে সময় সহম্পতি ব্রহ্মা প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান বুদ্ধ, আপনি ধর্ম প্রচার করুন। অনেকে আপনার সাধনালব্ধ ধর্ম বুঝবে।

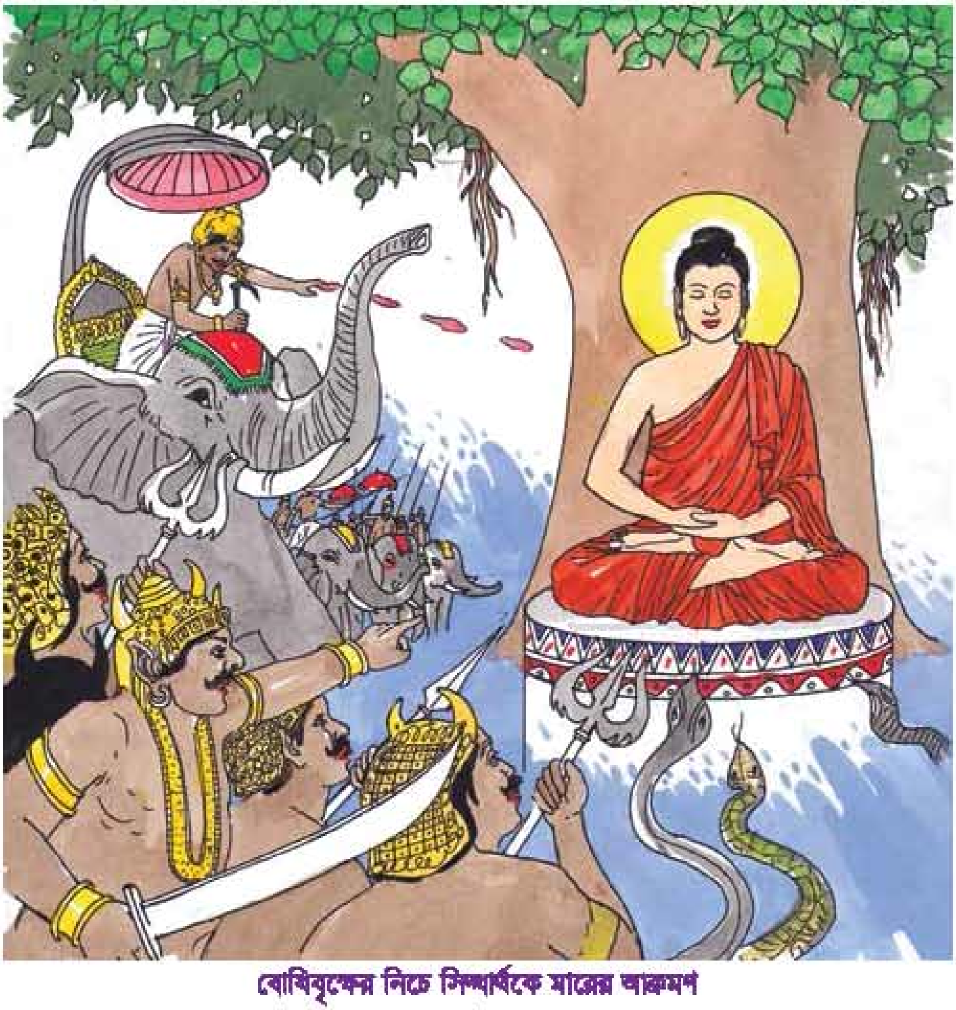

বোধিবৃক্ষের নিচে সিদ্ধার্থকে মারের আক্রমণ

তখন ভগবান বুদ্ধ প্রথম কার নিকট ধর্ম প্রচার করবেন চিন্তা করলেন। তিনি প্রথম আড়ার–কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রের নিকট ধর্ম প্রচার করার কথা চিন্তা করলেন। কিন্তু তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। তাই তিনি প্রথম জীবনের সংগী পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট ধর্ম প্রচার করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাই বুদ্ধ সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে গেলেন।

সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। তিনি পঞ্চবর্গীয় শিষ্য–কৌণ্ডিন্য, ভদ্দিয়, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিতের নিকট সর্বপ্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। তিনি শিষ্যদেরকে বললেন– 'হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিতদের জন্য সাধন পথে দুটি অন্তরায় পরিত্যাগ করা উচিত। আত্মপীড়ন না করা এবং অতি ভোগ-বিলাসের পথ ত্যাগ করা।' সাধনার জন্য মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা সাধকদের কর্তব্য। সে মধ্যম পথ হলো অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা–সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। চতুরার্য সত্যই জগতের প্রকৃত সত্য। তা উপলব্ধি করে সাধনা করাই সাধকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সিদ্ধার্থ গৌতম সকল প্রাণীর মঙ্গালের জন্য সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধে বিভক্ত।

বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের পূর্বে আয়ুষ্মান আনন্দকে সংগে নিয়ে কুশীনগর গমন করেন। মল্ল রাজাদের যমক শালমূলে উত্তর শিয়রে শয়ন করেন। এমন সময় দেবতাগণ বুদ্ধের ওপর পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ করেন। তখন বুদ্ধ আনন্দকে লক্ষ করে বললেন– 'হে আনন্দ, পুষ্প বৃষ্টির দ্বারা প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধকে পূজা করা হয় না। যে বুদ্ধের উপদেশ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে নিজ জীবনে আচরণ করে,এর দ্বারাই প্রকৃত বুদ্ধ পূজা হয়।'

ভগবান বুদ্ধ এরূপ উপদেশ প্রদান করে ধ্যানস্থ হন। প্রথম ধ্যান হতে দ্বিতীয় ধ্যানে, দ্বিতীয় ধ্যান হতে তৃতীয় ধ্যানে এবং সর্বশেষ চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. হিমালয়ের পাশে কোন রাজ্য ছিল?

ক. কপিলাবস্তু
খ. নালন্দা
গ. রাজগীর
ঘ. সারনাথ

২. সিদ্ধার্থ গৌতম প্রথম কোন বৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান করেন?

ক. অশ্বত্থ বৃক্ষ
খ. শালবৃক্ষ
গ. জম্বুবৃক্ষ
ঘ. চন্দনবৃক্ষ

৩. সিদ্ধার্থ গৌতমের মামাতো ভাইয়ের নাম কী ছিল?

ক. আনন্দ
খ. সোমানন্দ
গ. ব্রহ্মদত্ত
ঘ. দেবদত্ত

৪. সিদ্ধার্থ গৌতমের সারথির নাম কী ছিল?

ক. অলক
খ. ছন্দক
গ. পুলক
ঘ. খুদ্দক

৫. সিদ্ধার্থ গৌতম কোন দিকে মুখ করে বজ্রাসনে বসেন?

ক. পূর্বমুখী
খ. দক্ষিণমুখী
গ. পশ্চিমমুখী
ঘ. উত্তরমুখী

৬. কোন পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করে বুদ্ধ হন।

ক. বৈশাখী পূর্ণিমা
খ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা
গ. আশ্বিনী পূর্ণিমা
ঘ. মাঘী পূর্ণিমা

২০২০

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শিশুটি .... হয়েই সাত পা হেঁটে সামনে গেল।
২. এমন সময় একটি হাঁস তাঁর সামনে এসে ....।
৩. সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে অত্যন্ত .... ছিলেন।
৪. .... দুঃখ কীভাবে দূর করবেন নীরবে বসে ভাবতেন।
৫. নবজাত শিশুকে এক পলক .... করে গৃহত্যাগ করেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে	১. অশ্ব সাজিয়ে আনল।
২. তিনি সব সময় নির্জনে বসে	২. সংবাদ সকলকে জানাল।
৩. সারথি ছন্দক	৩. রক্ত-মাংস শুকিয়ে যাক।
৪. সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের	৪. করে বোধিজ্ঞান লাভ করেন।
৫. এ আসনে আমার	৫. অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন।
৬. সিদ্ধার্থ গৌতম সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয়	৬. চিন্তামগ্ন থাকতেন।
	৭. সফরে গেলেন।

ঘ. নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকালে কী কী নাম ছিল?
২. সিদ্ধার্থ গৌতম বুকে তীরবিদ্ধ হাঁসটিকে কী করলেন?
৩. সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে কোন কোন বিদ্যা শিক্ষা করেন?
৪. পাপমতি মার সিদ্ধার্থ গৌতমকে কীভাবে আক্রমণ করল?
৫. পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম লেখ।
৬. বুদ্ধ পরিনির্বাণের সময় আনন্দকে উদ্দেশ করে কী উপদেশ দেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্য জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা কর।
২. সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগের বর্ণনা দাও।
৩. সুজাতার পায়সান্ন দানের বিবরণ দাও।
৪. সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের ঘটনা বর্ণনা কর।
৫. বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তনের বর্ণনা দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্দনা ও নিত্যকর্ম

বন্দনা অর্থ প্রণাম, স্তুতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি। বৌদ্ধদের নিকট ত্রিরত্ন পরম আধার বা আশ্রয়। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন বলা হয়। ত্রিরত্নকে প্রণাম করাই হচ্ছে ত্রিরত্ন বন্দনা। বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করে। প্রত্যেকে বৌদ্ধ বিহারে বা বাড়িতে নিয়মিত বন্দনা করতে পারে।

প্রতিদিন যথাসময়ে বন্দনা ও প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পাদন করতে হয়। এগুলো নিত্যকর্ম। আবার যথাসময়ে ঘুম থেকে ওঠা, হাত-মুখ ধোয়া, পড়ার টেবিলে বসা এগুলোও নিত্যকর্ম। এছাড়া ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পিতা-মাতাকে কাজে সাহায্য করাও তোমাদের কর্তব্য।

নিম্নে ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ও বাংলায় প্রদত্ত হলো-

পালি

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে-
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা,
সম্বোধিমাগঞ্চি অনন্ত ঞানো-
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।

বঙ্গানুবাদ

যেই লোকোত্তম অনন্ত জ্ঞানী সম্যক সম্বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ বোধিমূলে অবস্থান করে মার সেনার সাথে যুদ্ধ করে মহান বিজয়ী হয়ে সম্বোধি লাভ করেছিলেন, আমি সেই বুদ্ধকে প্রণাম করছি।

পালি

অট্ঠঙ্গিকো অরিয়পথো জনানং-
মোক্খপ্পবেসা যুজুকোব মগ্গো
ধম্মো অযং সন্তি করো পণীতো-
নীয্যানিকো তং পণমামি ধম্মং।

২০২০

বঙ্গানুবাদ

জনগণের অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট আর্যপথ, মোক্ষ প্রবেশের সোজা রাস্তা স্বরূপ, শান্তিকর, শ্রেষ্ঠধর্ম এবং যেই ধর্ম নির্বাণে নিয়ে যায়, সেই ধর্মকে আমি প্রণাম করছি।

পালি

সংঘো বিসুদ্ধো বর দক্খিণেয্য–
সন্তি ন্দ্রিযো সব্বমলপ্পহীণো,
গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপ্পত্তো–
অনাসবো তং পণমামি সংঘং।

পিতা–মাতার সাথে ত্রিরত্ন বন্দনারত কিশোর–কিশোরী ও বালক–বালিকা

বঙ্গানুবাদ

যিনি বিশুদ্ধ সংঘ দান গ্রহণের উত্তমপাত্র, শান্তেন্দ্রিয়, সকল প্রকার পাপমলবিহীন, অনেক প্রকার গুণভূষিত ও আশ্রব ক্ষয়কারী, আমি সে সংঘকে প্রণাম করছি।

প্রতিদিন যথাসময়ে যেই কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে নিত্যকর্ম বলে। প্রতিটি শিশু–কিশোর, বালক–বালিকা তার নিত্যকর্ম সম্পাদন করবে। বয়স্করাও এই নিয়ম মেনে চলবে। পৃথিবীতে মাতা–পিতা হলেন পরম গুরু। মাতা–পিতা হলো পুত্র–কন্যার জন্ম-দাতা। কিন্তু জ্ঞানদাতা হিসেবে শিক্ষাগুরুর আসন অনেক ওপরে। শিক্ষকগণ অকৃপণভাবে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শিক্ষার্থীর মনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেন। এজন্য মাতা–পিতার মতো শিক্ষাগুরুর স্থানও অতি ওপরে।

সংসারে মাতা-পিতা ও শিক্ষাগুরু ব্যতীত আরও অনেক গুরুজন আছেন। লোক সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠগণ মাত্রই গুরুজন। এহেন গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য। শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে। এতে মানবিক গুণের বিকাশ হয়। গুরুদের প্রতি বিনম্র ভাব পোষণ করা উচিত। গুরুদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করবে। সুন্দর ব্যবহারে গুরুদের নিকট আশীর্বাদ লাভ করা যায়। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে– গুরুজন, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শীলবান ব্যক্তিদের অভিবাদন করবে। অভিবাদন করলে আয়ু–বর্ণ–সুখ–বল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

গুরুদের গুণ বর্ণনা করা যায় না। এদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করলে নিজের জীবনের মঙ্গল হয়। এ ছাড়াও নিজে সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হবে।

প্রত্যেকেরই দায়িত্ববোধ থাকতে হয়। পরিবার ও সমাজের প্রতিও মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। পরিবারের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখতে হয়। তাঁদের সুখে–দুঃখে সহায়তা করার দায়িত্ব রয়েছে। গুরুজনদের আদেশ-উপদেশ মতে সংসারের কাজ সম্পাদন করতে হয়। পরিবারের ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা পোষণ করা কর্তব্য। তাদের লেখাপড়ার প্রতি যত্ন নেবে। সমাজের যেকোনো কাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। সমাজে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজকে নিজের মনে করে অংশগ্রহণ করতে হয়। তাদের বিপদে-আপদে রক্ষা করতে হয়। আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবে যোগদান করতে হয়।

সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দাহকার্য, বিবাহকার্য অনুষ্ঠিত হয়। এসব উৎসব

ব্যতীতও আরও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উৎসব রয়েছে। সেসব সামাজিক উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আগ্রহী হবে। সাধ্যমতো এরূপ কাজ সম্পাদনের জন্য অংশগ্রহণ করবে। এর দ্বারা পরিবার ও সমাজের উন্নতি সাধিত হয়।

একতাই বল। সংঘের মিলন সুখকর। একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। এর দ্বারা মানুষ বৃহত্তর কাজকে সহজে সমাধান করতে পারে। পরিবারে ও সমাজে অনেক কাজ থাকে। অনেক সময় সব কাজ একা করা সম্ভব নয়। কিন্তু একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে গুরুত্বপূর্ণ কাজও সহজে সমাধান করতে পারা যায়। এজন্য মানুষ আধুনিক যুগে বিভিন্ন লোক সমন্বয়ে সংগঠন গড়ে তোলে। সমবায় সমিতি গঠনের দ্বারা পরিবার ও সমাজে বৃহত্তর কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন রকম অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু সমাজ নয়, পৃথিবীর মানুষও আজ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়েছে। তারা পৃথিবীর মানুষের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করছে। এ কারণে পৃথিবীর মানুষ সুখ-শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেছে। সে কারণে পারিবারিক ও সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে একতাবদ্ধ হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে নিজের ও পরের হিতসাধন করতে সক্ষম হবে।

মানব জাতির মঙ্গলের জন্য যৌথ কর্মকাণ্ডের বিকল্প নেই। যৌথ কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানুষ শিল্প–কারখানা গড়ে তুলে উন্নতির শিখরে উঠেছে। গৌতম বুদ্ধ সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে তা দেশনা করেছেন। তাতে যৌথভাবে কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মাত্রই যৌথভাবে কাজ করার অভ্যাস করা কর্তব্য। সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যৌথভাবে কাজ করলে একজন অন্যজনের প্রতি বিশ্বাস জন্মে। সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। কঠিন কাজও যৌথভাবে সহজে সমাধান করতে পারা যায়। এ কারণে সব কাজ সহজে সুসম্পন্ন হয়। এতে সুফল লাভ হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে একত্রে কী বলা হয়?

ক. বুদ্ধরত্ন খ. ধর্মরত্ন
গ. সংঘরত্ন ঘ. ত্রিরত্ন

২. কে দান গ্রহণের উত্তম পাত্র?

ক. ভিখারি খ. দিশারি
গ. দুঃশীল ব্রাহ্মণ ঘ. বিশুদ্ধ সংঘ

৩. শিক্ষাগুরুকে কী বলা হয়?

ক. সমাজপতি খ. ধর্মপতি
গ. সেনাপতি ঘ. জ্ঞানদাতা

৪. পৃথিবীতে মাতা-পিতা হলো–

ক. ধর্মীয় শিক্ষক খ. জীবন ভ্রাতা
গ. পরম গুরু ঘ. উত্তম দেবতা

৫. বুদ্ধ সমাজ উন্নয়নের জন্য কোন ধর্ম দেশনা করেছেন –

ক. রতন সূত্র খ. ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র
গ. মৈত্রী সূত্র ঘ. সপ্ত অপরিহানীয় সূত্র

৬. কার মিলন সুখকর?

ক. সংঘের খ. মানুষের
গ. স্বামী–স্ত্রীর ঘ. ভাই–বোনের

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. মাতা-পিতা হলেন পুত্র–কন্যার ....।
২. লোক সমাজে .... মাত্রই গুরুজন।
৩. গুরুদের প্রতি .... পোষণ করা উচিত।

৪. .... ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতা পোষণ করা কর্তব্য।
৫. সংঘের .... সুখকর।
৬. শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের প্রতি .... দেখাবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

১. বৌদ্ধরা প্রতিদিন	১. শিক্ষাগুরুর স্থানও অতি ওপরে।
২. শিক্ষকগণ অকৃপণভাবে	২. সুখ, বল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।
৩. এজন্য মাতা–পিতার মতো	৩. উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।
৪. অভিবাদন করলে আয়ু, বর্ণ,	৪. সকাল–সন্ধ্যা বন্দনা করে।
৫. সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে	৫. জন্য অংশগ্রহণ করবে।
৬. সাধ্যমতো এরূপ কাজ সম্পাদনের	৬. শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।
	৭. সুফল লাভ হয়।

ঘ. নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ত্রিরত্ন বন্দনা কাকে বলে?
২. নিত্যকর্ম কাকে বলে?
৩. গুরুজনদের প্রতি কীরূপ ব্যবহার করবে?
৪. পরিবার ও সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী?
৫. একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে কী উপকার হয় লেখ।
৬. যৌথভাবে কাজ দ্বারা সমাজের কী কী উপকার হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. নিত্যকর্মের বর্ণনা দাও।
২. মাতা-পিতার গুণ বর্ণনা কর।
৩. শিক্ষাগুরুর গুণ সম্পর্কে লেখ।
৪. পরিবার ও সমাজে বাস করতে হলে আমাদের কী করা কর্তব্য? বর্ণনা দাও।
৫. ধর্মীয় উৎসবে আমাদের কী করা কর্তব্য? এ সম্পর্কে লেখ।
৬. একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে যে সুফল লাভ হয় তার বর্ণনা দাও।

২০২০

তৃতীয় অধ্যায়

পূজা ও দান

বৌদ্ধধর্মে পূজা ও দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পূজা ও দান দুটিই পুণ্যকর্ম, যা দিয়ে মনকে পবিত্র ও সংযত করা যায়। দানচিত্ত উৎপন্ন করতে পূজা ও দানের ভূমিকা অপরিসীম। তাই বৌদ্ধরা নিয়মিত পূজা ও দান করে থাকে। প্রথমে আমরা পূজার গুরুত্ব ও গুণসমূহ জানব।

বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল–বিকাল বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পূজা দিয়ে থাকে। এই পূজার মাধ্যমে দান চেতনা উৎপন্ন হয় এবং সৎকর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। চিত্তে মৈত্রী, করুণা ও উদারতা জাগ্রত হয়। পূজা নানা ধরনের, যেমন: আহার পূজা, পুষ্প পূজা, পানীয় পূজা, প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা প্রভৃতি।

এতে তোমরা প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা সম্পর্কে জানবে।

প্রদীপ পূজা

বৌদ্ধরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা করে থাকে। প্রদীপের আলো অন্ধকার দূর করে। অনুরূপভাবে বুদ্ধ জ্ঞানের আলো দ্বারা অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, তৃষ্ণা, মনের কালিমা লোভ–দ্বেষ–মোহ প্রভৃতি দূর করেছিলেন। তা ছাড়া প্রদীপের আলো যেমন ক্ষণস্থায়ী, প্রদীপ পূজার মাধ্যমে আমরা জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বা অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। অনিত্য ভাবনা দ্বারা লোভ-দ্বেষ-মোহ, তৃষ্ণা প্রভৃতি ক্ষয় হয়। অজ্ঞানতা দূর করে জ্ঞানালোকে আলোকিত হওয়ার জন্য বৌদ্ধরা প্রদীপ দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করে থাকেন।

প্রদীপ পূজা বিহার বা প্যাগোডায় গিয়ে অথবা নিজ গৃহে করা যায়। আমরা জানি যে, কোনো পূজা দেওয়ার পূর্বে মন ও দেহকে পবিত্র করতে হয়। পরিচ্ছন্নতা দেহ ও মনের আনন্দ আনয়ন করে। মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করে।

প্রদীপ পূজার পূর্বে পবিত্র মনে বুদ্ধের ছবি বা বুদ্ধমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তারপর প্রদীপ হাতে করজোড়ে হাঁটু ভেঙে বসে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। এরপর পূজার গাথাটি বিশুদ্ধ মনে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে হয়।

পিতা-মাতার সঙ্গে প্রদীপ পূজারত বালক-বালিকা

প্রদীপ পূজা গাথাটি নিম্নরূপঃ

পালি

ঘনসারপ্প দিত্তেন দীপেন তমধংসিনা,
তিলোক দীপং সম্বুদ্ধং পূজযামি তমোনুদং।

বঙ্গানুবাদ

ঘনসার তৈলযুক্ত প্রদীপ অন্ধকার দূর করে। সে প্রদীপ দিয়ে ত্রিলোকের অজ্ঞানতা বিনাশকারী সেই সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে পূজা করছি।

পদ্যাকারে প্রদীপ পূজা

অন্ধকার ধ্বংসকারী এ দীপ দানে
পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে।

দীপের আলোক যথা অন্ধকার হরে,
জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে মোহ দূর করে।

এ সলিতা এ তৈল যবে ফুরাইবে,
তখনি এ আলোকিত দীপ যাবে নিভে।

এরূপ তৃষ্ণা তৈল গেলে ফুরাইয়া,
জীবনের দুঃখ শিখা যায় নিভিয়া।

এ বন্দনা এ পূজা এ জ্ঞান প্রভায়,
সর্ব তৃষ্ণা, সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায়।

গাথা আবৃত্তির পর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে বুদ্ধকে প্রণাম করবে। এরপর সুন্দর করে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের সম্মুখের আসনে প্রদীপ জ্বালাবে। প্রদীপ জ্বালানোর পর আবার দুই হাঁটু ভেঙে বুদ্ধকে প্রণাম জানাবে। বুদ্ধের গুণ অনুসরণ করবে। প্রদীপের আলোর ন্যায় জীবন গড়ার শপথ নেবে। অনিত্য ভাবনা করবে। ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা চিন্তা করবে।

ধূপ পূজা

সুগন্ধ ধূপ দিয়েই এই ধূপ পূজা করা হয়। ধূপের সুগন্ধ ও সুবাস যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি আমাদের কুশল কর্মের সুবাস সর্বত্র বিরাজ করে। ধূপ পূজায় আমাদের হৃদয়ের সৎ চেতনা ও সৎ কর্মের ভাব জেগে ওঠে। এতে মন আনন্দে ভরে যায়।

সকাল-বিকাল দুই বেলা প্রার্থনার সময় ধূপ পূজা করা যায়। তবে ধূপ পূজার উত্তম সময় হলো সন্ধ্যাবেলা। ধূপ পূজার জন্য প্রয়োজন ধূপদানি অথবা ধূপকাঠি। ধূপদানিতে ধূপ রেখে অথবা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বুদ্ধকে পূজা করতে হয়। বুদ্ধের সামনের বেদিতে এ পূজা দিয়ে প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। তারপর ভক্তিচিত্তে ধূপ পূজার গাথাটি আবৃত্তি করতে হয়। একাগ্রচিত্তে গাথা আবৃত্তি না করলে চিত্তে প্রীতিভাব আসে না।

ধূপ পূজা গাথাটি নিম্নরূপ:

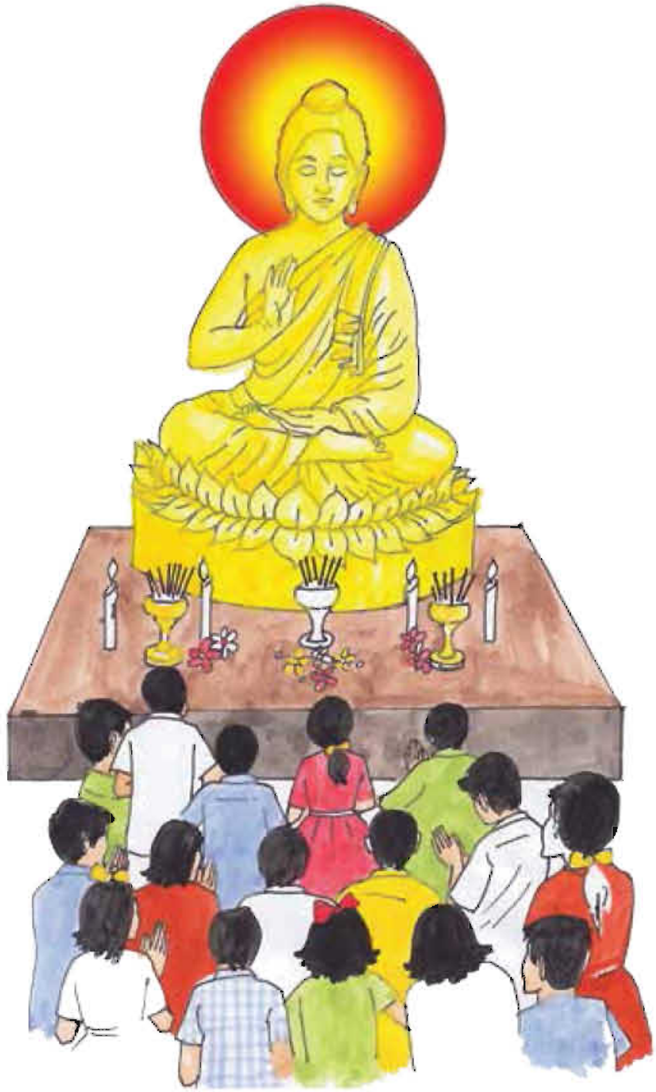

ধূপ পূজারত বালক–বালিকা

পালি

গন্ধসম্ভার যুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা,
পূজযে পূজনেয্যন্তং পূজা–ভাজন মুত্তমং।

বঙ্গানুবাদ

গন্ধসম্ভারযুক্ত এ সুগন্ধ ধূপের দ্বারা
আমি সেই পূজাযোগ্য বুদ্ধকে পূজা করছি।

পদ্যাকারে ধূপ পূজা

গন্ধসম্ভারযুক্ত এ ধূপ দানে,
পূজিতেছি ভক্তিচিত্তে বুদ্ধ ভগবানে।

ধূপের সুগন্ধে চারিদিক হয় সুবাসিত,
পুণ্যের সঞ্চয় তেমনি হয় সুরভিত।

সুগন্ধি এ ধূপদানে তোমায় মোরা স্মরি,
জন্ম–জন্মান্তরে যেন পুণ্য লাভ করি।

গাথা আবৃত্তি শেষে ভক্তিচিত্তে করজোড়ে বুদ্ধের উদ্দেশে প্রণাম করবে। বিহারে গিয়ে অথবা নিজ বাড়িতে ধূপ পূজা করা যায়। তোমরা নিজে পূজা দেবে এবং এ গাথাগুলো শ্রদ্ধার সাথে সুর করে আবৃত্তি করবে। এতে তোমাদের চিত্ত নির্মল হবে এবং বুদ্ধের প্রতি গভীর ভক্তি উৎপন্ন হবে।

দান

মানব জীবনে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। ‘দান’ শব্দের অর্থ হলো ত্যাগ। এই ত্যাগ হলো নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু দেওয়া বা দান করা। নিঃস্বার্থ ত্যাগই প্রকৃত দান। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত উদার হয়, ত্যাগশক্তি বৃদ্ধি পায়। দানের মাধ্যমে দুস্থ, অসহায়দের

২০২০

প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টি হয়। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং লোভ, দ্বেষ, মোহ বিদূরিত হয়। শুধু তাই নয়, দান স্বর্গের সোপান স্বরূপ। দান মানুষের দুঃখ ত্রাণকারীও বটে। তাই ইহকাল ও পরকালে শান্তি সুখ লাভের আশায় মানুষ দান দিয়ে থাকে। দানীয় বস্তু বা দানীয় সামগ্রী নিয়ে পালিতে একটি গাথা আছে। যেমন–

পালি

অন্ন, পানং, বত্তং, যানং,
মালাগন্ধ, বিলেপনং,
সেয্যা, বসত, প্রদীপেয্যং
দানবত্থু ইমে দসা।

বঙ্গানুবাদ

অন্ন, জল, বস্ত্র, যান, মাল্য, গন্ধ আর বিলেপন, শয্যা, গৃহ, প্রদীপ – এই দশ প্রকার দানবস্তু শাস্ত্রের বচন।

এ ছাড়াও নানা ফল–মূল, অর্থ–বিত্ত, জায়গা–জমি প্রভৃতি দান করা যায়। তবে বৌদ্ধ মতে সর্বোৎকৃষ্ট দান হলো ধর্ম দান ও বিদ্যা দান।

দানের পূর্বে দাতাকে তিনটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। যেমন :

১. দানীয় বস্তু সৎ উপায়ে অর্জিত হতে হবে।
২. লোভ, দ্বেষ ও মোহশূন্য হয়ে উদারচিত্তে দান দিতে হবে।
৩. সৎ পাত্রে দান দিতে হয়।

মানুষের মধ্যে শীলবান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। তাই শীলবান ব্যক্তিকে বা ভিক্ষু শ্রামণকে দান দিলেই বেশি পুণ্য লাভ হয়।

দান বিভিন্ন রকম। যেমন : সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান, কঠিন চীবর দান ইত্যাদি।

অষ্টপরিষ্কার দান

বৌদ্ধধর্মে দান একটি অন্যতম পুণ্যকর্ম। এ দান অনেকখানি সংঘদানের মতো। বৌদ্ধরা নিজের কিংবা পরিবার-পরিজনের মঙ্গল কামনায় ও সুখ-শান্তি লাভের আশায় এ দান করে থাকে। এ দানে জ্ঞাতিগণেরও মঙ্গল হয়। দাতারও পুণ্য সঞ্চয় হয়।

অষ্টপরিষ্কার দান বলতে ভিক্ষুর ব্যবহার্য আটটি দ্রব্য সামগ্রীকে বোঝায়। এগুলো হলো– সংঘাটি, উত্তরাসংঘ, অন্তর্বাস, পিন্ডপাত্র, ক্ষুর, সূচ, সুতা, কটিবন্ধনী ও জলছাঁকুনি।

যেকোনো দায়ক ইচ্ছা করলে বছরের যেকোনো সময় এ দান একাধিকবার করতে পারে। ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যেই এ দান দেওয়া হয়। নিজ গৃহে অথবা বিহারে এই দান সম্পন্ন করা যায়। এ দান করতে কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়। বৌদ্ধ দায়ক–দায়িকারা ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ বা ফাং করেন।

অষ্টপরিষ্কার দানের নিয়ম হলো ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে নানা দানীয় বস্তু সাজিয়ে ভিক্ষুসংঘের সামনে রাখতে হয়। তারপর পরিবারের সদস্য, স্বজন-পরিজন ও আমন্ত্রিত অতিথিরা সকলে ভিক্ষুসংঘের সামনে করজোড়ে বসেন। প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা করে পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। এরপর ভিক্ষুদের মুখে মুখে অষ্টপরিষ্কার দানের গাথাটি তিনবার আবৃত্তি করতে হয়। গাথা আবৃত্তির সময় চিত্তকে প্রফুল্ল রাখতে হয়। দানের প্রতি মনোযোগ রাখতে হয়।

গাথাটি নিম্নরূপ :

ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেম।
দুতিযম্পি ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেম।
ততিযম্পি ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেম।

বঙ্গানুবাদ

উপকরণসহ এ অষ্টপরিষ্কার দানীয় বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।
দ্বিতীয়বার উপকরণসহ এ অষ্টপরিষ্কার দানীয় বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।
তৃতীয়বার উপকরণসহ এ অষ্টপরিষ্কার দানীয় বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।

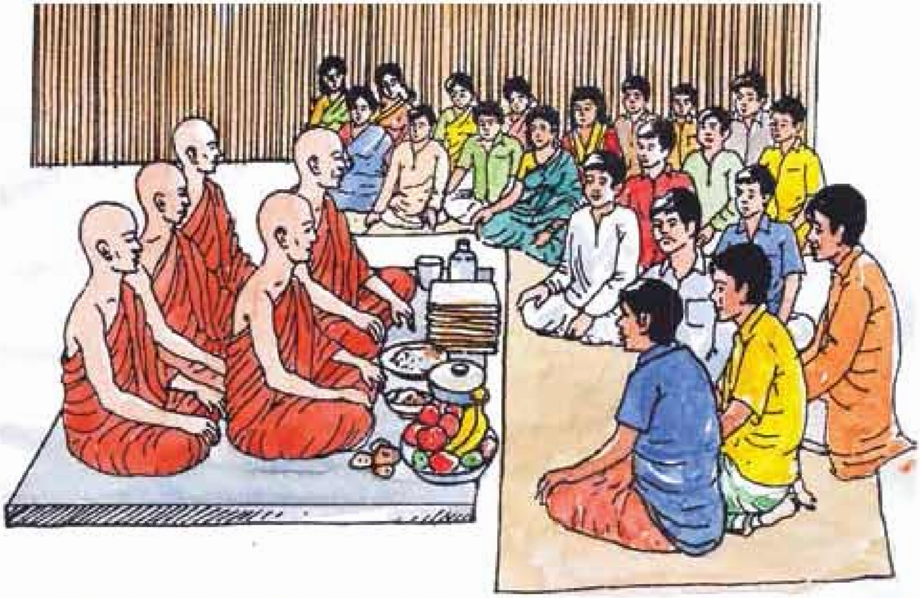

অষ্টপরিষ্কার দানে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ ও দায়ক–দায়িকাসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

অষ্টপরিষ্কার দানের পূর্বে ভিক্ষুগণ জীবিত ও মৃত জ্ঞাতিগণের মঙ্গলের জন্য সূত্রপাঠ করেন। অষ্টপরিষ্কার দানের গুরুত্ব তুলে ধরে ধর্মদেশনা করেন। দেশনা শেষে উপস্থিত দায়ক–দায়িকারা সাধু সাধু সাধু বলে তিনবার সাধুবাদ প্রদান করেন। এভাবে অষ্টপরিষ্কার দানকার্য সম্পন্ন করা হয়। এ দানের দ্বারা দাতার অশুভ ও অমঙ্গল দূর হয়। এতে দাতার জ্ঞাতিগণও সুখী হন।

তোমরা সব সময় দান করার অভ্যাস গড়ে তুলবে। মানুষের আপদে-বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। গরিব, দুঃখীকে সব সময় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাবে। প্রতিবেশীদেরও সাহায্য করবে। তোমাদের শ্রেণিতে কোনো দরিদ্র বন্ধু থাকলে তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করবে। তাকে খাতা কলম কিনে দেবে। প্রয়োজন হলে অর্থও দেবে।

তোমরা খাদ্যদ্রব্যও দান করবে। প্রতিবেশী বা দেশের যেকোনো দুর্যোগ, দৈব–দুর্বিপাকে দান দিতে এগিয়ে আসবে। সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। এতে জনসেবা তথা মানবসেবা হবে।

যেকোনো ক্ষুধার্ত প্রাণীকে দান দেওয়া ভালো। ছোটবেলা থেকেই তোমরা দানের অভ্যাস গড়ে তুলবে। দানে ত্যাগশক্তি বাড়ে। দানের পুণ্য ফলে জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়। মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করা যায়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বুদ্ধ হলেন–

ক. আলোর প্রদীপ
খ. ধ্যানের প্রদীপ
গ. বিত্তের প্রদীপ
ঘ. চিত্তের প্রদীপ

২. আমাদের মনে কিসের প্রদীপ জ্বালাতে পারি?

ক. রাতের প্রদীপ
খ. দিনের প্রদীপ
গ. জ্ঞানের প্রদীপ
ঘ. কামনার প্রদীপ

৩. প্রদীপের আলো–

ক. চিরস্থায়ী
খ. অর্ধস্থায়ী
গ. ঊর্ধ্বস্থায়ী
ঘ. ক্ষণস্থায়ী

৪. ধূপ পূজার জন্য কোন সময় উত্তম?

ক. সন্ধ্যা বেলা
খ. সকাল বেলা
গ. দুপুর বেলা
ঘ. বিকাল বেলা

৫. সংঘদান কাদের দান করা হয়?

ক. দায়ক–দায়িকাকে
খ. শ্রমণদেরকে
গ. ভিক্ষুসংঘকে
ঘ. জ্ঞাতিগণকে

৬. দানের পূর্বে দাতাকে কয়টি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়?

ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পৃথিবীর সবকিছুই ....।
২. সর্বতৃষ্ণা, ... ক্ষয় যেন হয়।
৩. ধূপের .... মতো আমাদের কুশলকর্মের সুবাস যেন বিরাজ করে।
৪. পুণ্যের .... তেমনি হয় সুরভিত।
৫. দানের গুরুত্ব মানব জীবনে ....।
৬. মানুষের মধ্যে .... ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

২০২০

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. বৌদ্ধধর্মে পূজা	১. প্রদীপ ছড়াতে পারি।
২. সমাজ ও বিশ্বে জ্ঞানের	২. দেওয়াই উত্তম।
৩. ঘনসার তৈলযুক্ত প্রদীপ	৩. ও দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৪. ধূপ পূজায় আমাদের হৃদয়ের সৎ চেতনা	৪. ও সৎ কর্মের ভাব জেগে ওঠে।
৫. অষ্টপরিষ্কার দান বলতে	৫. অন্ধকার দূর করে।
৬. সৎ পাত্রে দান	৬. ভিক্ষুসংঘকে প্রদত্ত নানা দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়।
	৭. সুগতি লাভও করা যায়।

ঘ. নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. দান শব্দের অর্থ কী? দান করলে কী হয়?
২. প্রদীপ পূজা করলে কী হয়?
৩. জীবন অনিত্য কেন?
৪. অষ্টপরিষ্কার দান করতে কয়জন ভিক্ষুর প্রয়োজন? ভিক্ষুরা সেখানে কী করেন?
৫. দানের পূর্বে দাতাকে কী কী বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়?
৬. কাকে দান দিলে বেশি পুণ্য লাভ হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. প্রদীপ পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।
২. পদ্যাকারে ধূপ পূজাটি লেখ।
৩. অসহায়-দুস্থদের সাহায্য করা উচিত কেন বর্ণনা কর?
৪. ধূপ পূজার পালি গাথাটি লেখ।
৫. অষ্টপরিষ্কার দানের নিয়মাবলি বর্ণনা কর।
৬. দানের সুফল তুলে ধর।

২০২১

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রামণ্য শীল

শীল শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র, নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা। সুশীল বালক বলতে চরিত্রবান বালককেই বোঝায়। সুতরাং একজন সৎ মানুষের চারিত্রিক গুণাবলিকে শীল বলে।

শ্রামণ্য শীল বলতে দশশীলকে বোঝায়। অর্থাৎ শ্রামণগণ যে শীল পালন করেন তাকে শ্রামণ শীল বলা হয়। প্রত্যেক গৃহীকে একবার হলেও শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নিতে হয়। শ্রামণ বলতে শিক্ষার্থীকে বোঝায়। শ্রামণ হচ্ছে ভিক্ষু হবার প্রাথমিক স্তর। শ্রামণ হয়ে কমপক্ষে এক সপ্তাহ থাকতে হয়। শ্রামণদের নিত্য পালনীয় শীলই দশশীল। শ্রামণেরা সৎকর্মে রত থাকেন।

প্রব্রজিতেরা সুখের পথ খুঁজে পান। তাঁদের পুণ্যকর্ম করার যথেষ্ট সময় থাকে। তাঁদের পুণ্যকর্ম পরিশুদ্ধ থাকে। তাতে মুক্তির পথ সুগম হয়। বুদ্ধশাসনে পুত্র দান করলে মাতা-পিতার প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হয়। সুষ্ঠু ধর্মীয় জীবন গঠনই প্রব্রজ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্য।

এখন আমরা গৃহীশীল ও শ্রামণ্য শীলের পার্থক্য কী তা জানব। গৃহী বা উপাসক–উপসিকারা নিত্য পঞ্চশীল পালন করে থাকে। তারা পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে অষ্টশীলও পালন করে। সুতরাং পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গৃহীদের প্রতিপাল্য বিষয়।

গৃহীদের মধ্যে যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নেন তাঁদের শ্রামণ বলা হয়। শ্রামণ হচ্ছে গৃহী ও ভিক্ষুর মধ্যবর্তী স্তর। ভিক্ষু হতে হলে প্রথমে শ্রামণ হতে হয়। শ্রামণদের দশশীল পালন করতে হয়। তাদের বিহারের প্রাত্যহিক কর্মও সম্পন্ন করতে হয়। ভোরে ঘুম থেকে উঠে শ্রামণদের প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে হয়। তারপর ভালোভাবে হাত, মুখ ধুয়ে নিতে হয়। সকাল-বিকাল ভিক্ষুর নিকট দশশীল গ্রহণ করতে হয়।

এবার দশশীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তা জানব।

দশশীল গ্রহণ করার সময় নতজানু হয়ে হাত জোড় করে বসতে হয়। প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা

করতে হয়। তারপর গুরু ভিক্ষুর নিকট দশশীল প্রার্থনা করতে হয়। আবৃত্তি করার সময় পালি ও বাংলা উচ্চারণ শুদ্ধভাবে করতে হয়।

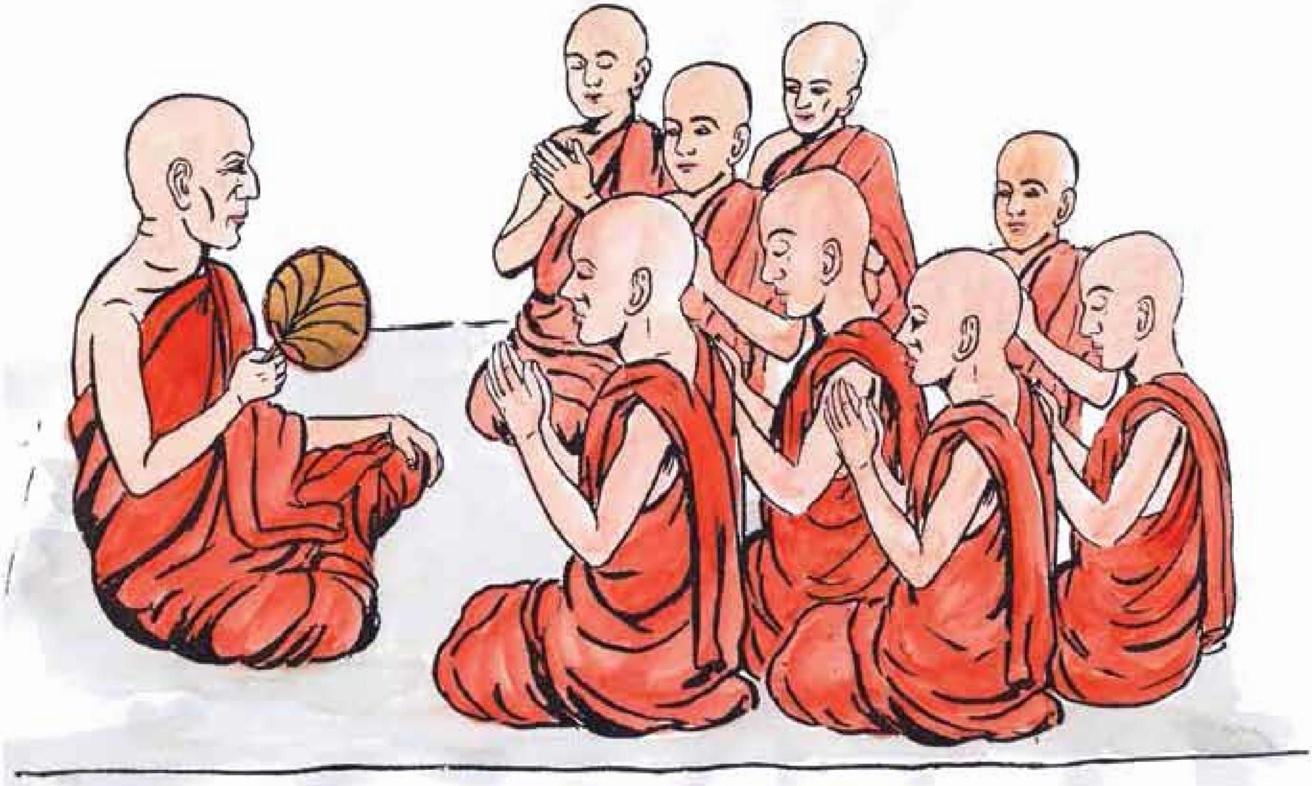

শ্রামণগণ গুরু ভন্তের নিকট দশশীল গ্রহণরত

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি, অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি, অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

২০২৩

দ্বিতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দশশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরামেরেয–মজ্জ–পমাদট্‌ঠনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৬. বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৭. নচ্চ–গীত–বাদিত–বিসুকদস্‌সনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৮. মালা–গন্ধ–বিলেপন–ধারণ মণ্ডন বিভূসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৯. উচ্চাসযন–মহাসযনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
১০. জাতরূপ রজত পটিগ্‌গহনা বেরমণী সিক্‌খপদং সমাদিযামি।

বাংলা অনুবাদ

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদত্তবস্তু গ্রহণ (চুরি) থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা–মদ নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নৃত্য–গীত–বাদ্য উৎসব প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. মাল্যধারণ, সুগন্ধ দ্রব্য লেপন, প্রসাধন দ্রব্য, অলংকার ব্যবহার থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৯. উচ্চাসন ও মহাশয্যায় শয়ন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
১০. সোনা–রুপা গ্রহণ থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

শীল পালনের মাধ্যমে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

সর্বজীবে দয়া, আত্মসংযম, সত্যবাদিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলো শিক্ষা লাভ করি। এ নৈতিক গুণগুলো তোমরাও অর্জন করবে। অন্যদেরও অর্জন করতে সহায়তা করবে।

দুষ্ট বালকদের তোমরা কীভাবে সৎপথে আনবে? মনে কর, তোমাদের কোনো বন্ধু ডোবার ব্যাঙকে ঢিল ছুড়ছে। কেউ বা একটি ছাগল ছানা ধরে অনর্থক মারধর করছে। মনে রাখবে, এগুলো অত্যন্ত খারাপ আচরণ। তোমরা এসব খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। এদের এভাবে কষ্ট দিবেনা। প্রাণীর প্রতি তোমাদের এই যে মমতা– এটাকেই বলে জীবে দয়া। এটা পঞ্চশীল, অষ্টশীল ও দশশীলের প্রথম শীল।

এবার শীলবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি ঘটনা বলব। তোমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে।

অনেক দিন আগের কথা। এক ব্রাহ্মণের ছেলে তক্ষশিলায় গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করত। সে মনোযোগের সাথে পড়ালেখা করে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করল। পরে সেই ব্রাহ্মণপুত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। বারাণসীর রাজা তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁকে রাজদরবারে পুরোহিতের পদে নিয়োগ করেন।

তিনি প্রতিদিন শীল পালন করতেন। কোনোদিন একটি শীলও ভঙ্গ করতেন না। রাজা–প্রজা সবাই শ্রদ্ধা করতেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন– আমাকে সবাই কেন শ্রদ্ধা করে তা পরীক্ষা করব।

তিনি একদিন রাজভাণ্ডার থেকে একখানি সোনার কাঠি তুলে নিলেন। ধনরক্ষক তাঁকে বেশি শ্রদ্ধা করতেন বলে প্রথম দিন কিছু বলল না। তিনি তিন দিনে তিনটি সোনার কাঠি রাজভাণ্ডার থেকে অন্য জায়গায় রেখে দিলেন। তখন ধনরক্ষক তাকে রাজার নিকট বেঁধে নিয়ে বলল, ইনি রাজকীয় ধন আত্মসাৎ করেছেন। রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন– ঠাকুর, একথা কি সত্য? ব্রাহ্মণ বললেন, মহারাজ, আমি আপনার ধন আত্মসাৎ করিনি। আমার জানতে ইচ্ছা হয়েছিল, শীলবান ও বিদ্বান এ দুজনের মধ্যে কার গুণ বেশি। এখন বুঝলাম, বিদ্বানের চেয়ে শীলবান বা চরিত্রবানই শ্রেষ্ঠ।

রাজা ব্রাহ্মণের প্রশংসা করলেন। তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁর কর্তব্য সততার ২০২৫

সাথে সম্পন্ন করতে লাগলেন। বল তো এই ব্রাহ্মণ কে? ইনি ছিলেন বোধিসত্ত্ব (গৌতম বুদ্ধ)। তিনি তাঁর পূর্ব জন্মের একটি উদাহরণ দিয়ে কাউকে চুরি না করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

বিদ্যা এবং চরিত্র দুটোই মানুষের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তার কোনো মূল্য নেই। তোমরাও বিদ্যা অর্জনের সাথে সাথে নিজেদের চরিত্র গঠন করবে। শীল হচ্ছে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার।

এবার শীল পালনের সুফল সম্পর্কে জানব।

একসময় বুদ্ধ ধর্ম প্রচার মানসে পাটলি গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় উপাসক-উপাসিকারা বুদ্ধকে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দান করেন। বুদ্ধ ভোজন শেষে তাদের উদ্দেশ্যে শীল পালনের সুফল বর্ণনা করেন। শীল পালনের সুফলগুলো নিম্নরূপ:

১. শীলবানদের শীল পালনের সুকীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
২. শীল পালনের দ্বারা সৎপুরুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা যায়।
৩. শীলবান ব্যক্তিরা সর্বদা নির্ভয় থাকে। নিঃসঙ্কোচে ও প্রফুল্ল চিত্তে যথা তথায় উপস্থিত হন।
৪. শীলবানেরা সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন।
৫. তাঁরা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।
৬. তাঁরা অপরের উপকার সাধন করে পুণ্য অর্জন করেন।
৭. তাঁদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁরা সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

তোমরা দুঃশীল বা চরিত্রহীন লোকের কী কী ক্ষতি হয় জান?

১. সে পাপ কাজ করে সৎবন্ধু হারায়।
২. সকলে তাকে নিন্দা করে।
৩. সে মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।
৪. সে অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে দিন কাটায়।
৫. তার দুর্নাম সর্বত্র প্রচারিত হয়।

জগতে সবাই সুখ চায়। দুঃখ কেউ চায় না। সুখ পেতে হলে সচ্চরিত্রবান হবে। পুণ্য পথে চলবে। এতে তোমরা ইহকাল ও পরকালে শান্তি লাভ করবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. গৃহী বা উপাসক–উপাসিকারা নিত্য কোন শীল পালন করে থাকে?

ক. দশশীল — খ. পঞ্চশীল
গ. প্রাতিমোক্ষ শীল — ঘ. ধুতাঙ্গ শীল

২. যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নেন তাঁদেরকে কী বলা হয়?

ক. ভিক্ষু — খ. ব্রাহ্মণ
গ. শ্রামণ — ঘ. শিক্ষক

৩. ব্রাহ্মণের ছেলে কোথায় গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করত?

ক. তক্ষশিলা — খ. বিক্রমশীলা
গ. পাহাড়পুর — ঘ. শ্রাবস্তী

৪. কোন দুটি মানুষের অমূল্য সম্পদ?

ক. ধন ও রত্ন — খ. টাকা ও পয়সা
গ. রাজা ও প্রজা — ঘ. বিদ্যা ও চরিত্র

৫. প্রকৃতপক্ষে পন্ডিত ব্রাহ্মণ কে ছিলেন?

ক. প্রত্যেক বুদ্ধ — খ. শ্রাবক বুদ্ধ
গ. বোধিসত্ত্ব — ঘ. আর্যমিত্র বুদ্ধ

৬. মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার কী?

ক. মণিমুক্তা — খ. শীল
গ. ধনরত্ন — ঘ. সোনা–রুপা

৭. শীলবানেরা মৃত্যুর পর কোথায় গমণ করেন?

ক. স্বর্গে — খ. নরকে
গ. মনুষ্যকুলে — ঘ. ব্রাহ্মণকুলে

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শ্রামণ্য শীল ভিক্ষু জীবনের .... স্তর ।
২. শ্রামণদের নিত্য .... শীলই দশশীল।
৩. শ্রামণ হচ্ছে গৃহী ও ভিক্ষুর......... স্তর।
৪. এখন বুঝলাম, বিদ্বানের চেয়ে .... শ্রেষ্ঠ।
৫. শীলবানেরা সজ্ঞানে.......... করেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. প্রব্রজিতেরা সুখের পথ	১. নিয়ে বাস করে।
২. পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গৃহীদের	২. মৃত্যুবরণ করেন।
৩. গৃহীরা পরিবার-পরিজন	৩. শীল প্রদান করুন।
৪. অনুগ্রহ করে আমাদের	৪. প্রতিপাল্য বিষয়।
৫. দুঃশীল ব্যক্তি মৃত্যুর পর	৫. খুঁজে পায়।
৬. শীলবানেরা সজ্ঞানে	৬. জীবন গঠন করতে হয়।
	৭. দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ঘ. নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. সুশীল বালক বলতে কাকে বোঝায়?
২. শ্রামণ্য শীল কাকে বলে?
৩. দশশীল কাদের পালন করতে হয়?
৪. নৈতিক গুণের তিনটি উদাহরণ দাও।
৫. পালি ‘মুসাবাদা’ শব্দের বাংলা অর্থ কী?
৬. ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাজপরিবারে কী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. শীলবান ব্যক্তির বিশেষ গুণগুলো তুলে ধর।
২. গৃহী শীল ও শ্রামণ্য শীলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
৩. দশশীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয় বর্ণনা কর।
৪. দশশীলের বাংলা অনুবাদ লেখ।
৫. শীলবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কাহিনীটি বর্ণনা দাও।
৬. শীল পালনের পাঁচটি সুফল উল্লেখ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি

অভিধর্ম পিটক

গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধরা এ ধর্মের অনুসারী। বুদ্ধ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্মবাণী প্রচার করেন। এ সময় তিনি শিষ্য ও অনুসারীদের নিকট ধর্মীয় রীতিনীতি, উপদেশ ও বাণী দেশনা করেছেন। এসব ধর্মবাণী যে সমস্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তার নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ।

তোমরা আগের শ্রেণিতে ত্রিপিটকের তিনটি অংশের কথা জেনেছ। সেই তিনটি হলো– ১. বিনয় পিটক, ২. সূত্র পিটক ও ৩. অভিধর্ম পিটক।

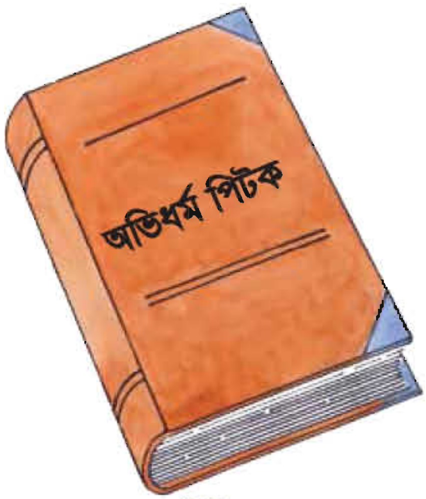

ত্রিপিটকের শেষ খণ্ড

ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। বুদ্ধের শিষ্যরা তাঁর উপদেশসমূহ মুখস্থ করে রাখতেন। তখন লিখন পদ্ধতির খুব বেশি প্রচলন ছিল না। সে কারণে বুদ্ধবাণী ত্রিপিটকে শিষ্য পরম্পরা মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল।

ইতোপূর্বে তোমরা বিনয় পিটক ও সূত্র পিটক সম্বন্ধে জেনেছ। অভিধর্ম হলো ত্রিপিটকের তৃতীয় ভাগ। এখন আমরা অভিধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস এবং অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে জানব।

ত্রিপিটক সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্বের পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। এতে দেখা যায়, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ প্রধানত ধর্ম ও বিনয় এই দুই ভাগে বিভক্ত। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্ম (সুত্ত) ও বিনয়ের সঙ্গায়ন হয়েছিল। এর একশত বছর পর যশ স্থবির কর্তৃক দ্বিতীয় সংগীতি আহবান করা হয়। এতেও আগের মতো ধর্ম (সুত্ত) ও বিনয়ের সঙ্গায়ন হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক রচিত হয়। এ সময় অভিধর্ম পিটকের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

সম্রাট অশোকের পুত্র থের মহেন্দ্র সিংহলে ধর্ম প্রচারে গমনকালে এ ত্রিপিটক সঙ্গে নিয়ে যান। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলের রাজা বট্টগামিনীর রাজত্বকালে ত্রিপিটক প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়।

নবাঙ্গ সত্থুসাসন

ত্রিপিটকের মধ্যে অনেক জায়গায় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের নয়টি অঙ্গ বা ত্রিপিটকের নয়টি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নয়টি বিভাগকে 'নবাঙ্গ সত্থুসাসন' বলা হয়। এই বিভাগ ত্রিপিটকের সম্পূর্ণ গ্রন্থকে বা কোনো বিশেষ বিশেষ গ্রন্থকে বোঝায় না। এই বিভাগ হলো বিষয়বস্তু অনুযায়ী ত্রিপিটকের বিভাজন। নবাঙ্গ সত্থুসাসনের নয়টি ভাগের নাম হলো : সুত্ত, গেয্য, বৈয্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্ভূতধম্ম ও বেদল্ল।

অভিধর্মের উৎপত্তি

অভিধর্ম ত্রিপিটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। অভিধর্মকে ত্রিপিটকের হৃৎপিন্ড বলা হয়।

মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ প্রথমে অন্যান্য ধর্মবাণী ঘোষণা করলেও অভিধর্ম বিষয়ে দেশনা করতে চাননি। কারণ সাধারণ মানুষ ও দেবগণ জটিল দর্শন ও মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারবে না। সে কারণে প্রথম সূত্র ও বিনয় বিষয়ে দেশনা করেন।

বুদ্ধ কালজ্ঞ, সর্বজ্ঞ ও ত্রিলোক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করার পর সপ্ত স্থানে বুদ্ধ অধিগত জ্ঞান ও ধর্মের তাৎপর্য চিন্তা করেন। ষষ্ঠতম সপ্তাহ দিবসে অভিধর্ম পিটকের ছয়টি গ্রন্থ নিয়ে চিন্তা করেন। সপ্তম সপ্তাহে সপ্তপ্রকরণ অভিধর্ম সম্পন্ন করেন।

এরপর বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন। সেখানে তিনি তিন মাসব্যাপী মাতৃদেবী ও দেবতাদের প্রথম অভিধর্ম দেশনা করেন।

তাবতিংস দেবলোক থেকে মর্ত্যে এসে মানবকল্যাণে অভিধর্ম দেশনা করেন। এভাবেই অভিধর্মের উৎপত্তি হয়।

অভিধর্ম পিটক কী?

তোমরা পূর্বেই জেনেছ, অভিধর্ম ত্রিপিটকের তৃতীয় ভাগ। এটি ত্রিপিটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পালি সাহিত্য মতে, ধর্ম ও অভিধর্মের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

শুধু ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দানের জন্য 'অভি' উপসর্গটি যুক্ত করা হয়েছে। অভিধর্ম শব্দের অর্থ বিশিষ্ট ধর্ম, অতিরিক্ত ধর্ম, অধিকতর ধর্ম। তাই বলা হয় সূত্রাতিরিক্ত ধর্মই অভিধর্ম। বিশেষত চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ—এ চারটি বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে অভিধর্ম পিটকে।

অভিধর্ম পিটকে যেসব গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর নাম ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা দরকার। অভিধর্ম পিটকে মোট সাতটি গ্রন্থ আছে। এ সাতটি গ্রন্থের সমষ্টিকে সপ্তপ্রকরণ বলা হয়। যথা : ১. ধম্মসঙ্গানি, ২. বিভঙ্গ ৩. ধাতুকথা ৪. পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তি ৫. কথাবত্থু ৬. যমক ৭. পট্ঠান।

প্রতিটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো–

১. ধম্মসঙ্গানি: এর অর্থ ধর্মের সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা। এটি অভিধর্ম পিটকের সারাংশ। এতে চিত্ত ও চৈতসিকের পরিচয়, জড় পদার্থের বর্ণনা আছে। বিশেষ করে কুশল ও অকুশল চিত্তের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মসঙ্গানির বিষয়বস্তু দর্শনতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক।

২. বিভঙ্গ: এ গ্রন্থের বিষয়ও দর্শনতাত্ত্বিক । এতে স্কন্ধ, ধাতু, ইন্দ্রিয়, তথা আমাদের শরীর ও মনের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। পঞ্চস্কন্ধ হলো রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।এর বিষয়বস্তু অতি চমৎকার।

৩. ধাতুকথা: ধাতুকথা শব্দের অর্থ 'ধাতু' সম্পর্কীয় কথা। বৌদ্ধধর্ম দর্শনের বেশ কিছু মৌলিক বিষয়ের তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। তাই এটি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম দর্শনশাস্ত্র। এতে ধ্যানপরায়ণ ভিক্ষুর মানসিক বৃত্তি সম্পর্কিত আলোচনা আছে। এছাড়াও পঞ্চস্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ধ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

৪. পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তি: 'পুগ্গল' শব্দের অর্থ ব্যক্তি,যা দ্বারা মানুষকে বোঝায়। 'পঞ্‌ঞত্তি' হলো প্রজ্ঞপ্তি, প্রকাশ বা পরিচয়। বিভিন্ন প্রকার পুরুষের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। এ গ্রন্থে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয় এবং পুদ্গল এই ছয় প্রকার প্রজ্ঞপ্তির উল্লেখ আছে।

৫. কথাবত্থু: এটি অভিধর্মের পঞ্চম গ্রন্থ। একে বৌদ্ধধর্ম দর্শন সম্পর্কিত তর্কশাস্ত্র বলা হয়। তৃতীয় সংগীতি শেষে মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য স্থবির কথাবত্থু রচনা করেন। মূলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মিথ্যাদৃষ্টি খণ্ডনই এ গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। কথাবত্থু তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পালি ত্রিপিটক সাহিত্যে কথাবত্থু গ্রন্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক–বিতর্ক

সৃষ্টি হয়েছে। মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির এই গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন থেরবাদ বা স্থবিরবাদই বুদ্ধের মূল নীতি। এটাকে বিভজ্যবাদও বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কথাবত্থু একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

৬. যমক: 'যমক' শব্দটি জোড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটিতে স্বপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষীয় প্রশ্নের সহজ সমাধান রয়েছে। এতে কুশল, অকুশল ও তাদের মূল সম্পর্কে আলোচনা আছে। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে রচিত এবং দশ প্রকার যমকে বিভক্ত। যেমন– মূল যমক, খন্ধ যমক, চিত্ত যমক, সচ্চ যমক ইত্যাদি।

৭. পট্ঠান: 'পট্ঠান' শব্দের অর্থ মূল কারণ বা প্রকৃত কারণ। এর বিষয়বস্তু প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কিত। বিশেষত নামরূপ বা শরীর ও মনের অনিত্যতা ও অনাত্মা সম্পর্কে আলোচনাই এ গ্রন্থে গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন– ১. আলম্বন ২. ধর্মনিশ্রয় ৩. কর্ম এবং ৪ অস্তি। নির্বাণ ব্যতীত সমস্ত জাগতিক বস্তুর কার্যকারণ নির্ণয় করাই এর প্রতিপাদ্য বিষয়।

অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলো ধর্ম ও দর্শনের মৌলিক ধারণা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক। বৌদ্ধদর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য এসব গ্রন্থ পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. গৌতম বুদ্ধ কোন ধর্ম প্রচার করেন?

ক. হিন্দুধর্ম খ. বৌদ্ধধর্ম
গ. জৈনধর্ম ঘ. খ্রিস্টধর্ম

২. বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের নাম কী?

ক. গীতা খ. বেদ
গ. ত্রিপিটক ঘ. ধর্মপদ

৩. বুদ্ধ সর্বপ্রথম কোথায় অভিধর্ম দেশনা করেন?

ক. তাবতিংস স্বর্গে   খ. বার্মা
গ. সারনাথে   ঘ. শ্রীলংকায়

৪. কোন সংগীতিতে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক সংকলিত হয়?

ক. প্রথম সংগীতি   খ. তৃতীয় সংগীতি
গ. দ্বিতীয় সংগীতি   ঘ. চতুর্থ সংগীতি

৫. অভিধর্ম পিটকে কয়টি গ্রন্থ আছে?

ক. সাতটি   খ. তিনটি
গ. পাঁচটি   ঘ. আটটি

৬. অভিধর্মকে ত্রিপিটকের কী বলা হয়?

ক. মস্তিষ্ক   খ. হৃৎপিণ্ড
গ. আদিতম   ঘ. বিশ্লেষক

৭. কোন রাজার সময় ত্রিপিটক প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়?

ক. বট্টগামিনী   খ. ধর্মপাল
গ. কনিষ্ক   ঘ. অজাতশত্রু

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. অভিধর্ম পিটক ত্রিপিটকের .... বিভাগ।
২. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের .... পর প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।
৩. কথাবত্থুকে বৌদ্ধধর্ম দর্শন সম্পর্কিত .... বলা হয়।
৪. মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য স্থবির .... রচনা করেন।
৫. যমক শব্দটি .... অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৬. পট্ঠান শব্দের অর্থ .... বা ....।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সাধারণ মানুষের মুখের	১. প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।
২. বুদ্ধের শিষ্যরা তাঁর উপদেশসমূহ	২. অন্যতম দর্শনশাস্ত্র।
৩. বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পর	৩. ভাষা ছিল পালি।
৪. বুদ্ধ কালজ্ঞ, সর্বজ্ঞ ও	৪. মুখস্থ করে রাখতেন।
৫. ধাতুকথা বৌদ্ধধর্মের	৫. ত্রিলোক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।
৬. ধর্মসঙ্গানির বিষয়বস্তু	৬. চিত্ত হলো মানুষের মন।
	৭. দর্শনতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক।

ঘ. নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ত্রিপিটক কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?
২. নবাঙ্গ সত্থুসাসন বলতে কী বোঝ?
৩. অভিধর্ম পিটককে সপ্তপ্রকরণ বলা হয় কেন?
৪. পঞ্চস্কন্ধ কী কী?
৫. অভিধর্ম পিটকের চারটি প্রধান আলোচ্য বিষয় কী কী?
৬. কখন ত্রিপিটক পূর্ণাঙ্গ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম লিখে যেকোনো দুটি গ্রন্থের বর্ণনা দাও।
২. ধর্মসঙ্গানি ও বিভঙ্গ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৩. পুগ্‌গল শব্দের অর্থ কী? এ গ্রন্থের বিশেষত্ব কী?
৪. কথাবত্থু গ্রন্থ কে রচনা করেন? এ গ্রন্থের বিশেষত্ব কী?
৫. পট্‌ঠান শব্দের অর্থ কী? এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬. যমক কাকে বলে? যমক গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ম ও কর্মফল

বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি হলো কর্মবাদ। ভালো কর্ম সুফল এবং মন্দ কর্ম কুফল প্রদান করে। এরূপ দৃষ্টি বা ধারণাকে কর্মবাদ বলে। কর্মের গতি বিচিত্র ও বহুমুখী। জীবন কর্মময়। প্রাণীরা কর্মফলের কারণে সুখ–দুঃখ ভোগ করে।

বুদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন:

প্রাণীগণ নিজ নিজ কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণীদের একান্ত আপন। সকলেই কর্মের উত্তরাধিকারী। কর্মই জীবের পুনর্জন্মের হেতু। কর্মই বন্ধু, কর্মই আশ্রয়। ভালো-খারাপ যে যেরূপ কর্ম করে সে সেরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম জীবকে হীন–শ্রেষ্ঠ, উচ্চ–নিচ নানাভাবে বিভক্ত করে।

ভগবান বুদ্ধ কুশল কর্মের কথা বলেছেন। ভালো কাজ করলে সকলের প্রশংসা পায়। পুণ্য লাভ হয়। জীবন সুন্দর হয়। সুখী হয়। মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে। সুকর্ম সুখকর ও আনন্দদায়ক। পুণ্যবান ব্যক্তিরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। তাঁদের নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। দীর্ঘায়ু হয়। ভালো কাজকে কুশল কর্ম বলে।

খারাপ কাজ করলে সবাই নিন্দা করে। পাপ উৎপন্ন হয়। পাপীরা দুঃখে পতিত হয়। কুকর্ম অনিষ্টকর ও দুঃখদায়ক। পাপীরা কুকর্মে লিপ্ত থাকে। তারা সকলের নিন্দার পাত্র হয়। লোভ, দ্বেষ ও মোহ এগুলো দুষ্কর্মের অন্তর্গত। পাপীরা মানুষের হিত ও মঙ্গল কামনা করে না। দুষ্কর্মের ফল ভোগ করে। মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। তাই খারাপ কাজকে অকুশল কর্ম বলে।

জীবনের অপূর্ণতা ও দুর্ভাগ্যের জন্য কাউকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। যার দুঃখ সে নিজেই সৃষ্টি করে। নিজের সুকর্মের জন্য নিজেই সুখ ভোগ করে। কুকর্মের জন্য দুঃখ ভোগ করে। মা-বাবা,আত্মীয়-স্বজন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। ছেলেমেয়েরা সৎজীবন গঠন করলে মা-বাবা আনন্দিত ও প্রশংসিত হয়। তাই বুদ্ধ বলেছেন– নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, অপর কেউ নয়। স্বর্গ–নরক নিজেদেরই পরিণতি। সেজন্য বলা হয়েছে–

সুকর্ম কুকর্ম হেথা উভয় প্রধান,
তাদের সহযোগে জীব সদা ভাসমান।

একদিকে পূর্ণ শান্তি পূর্ণতার দ্বার,
বিনির্মুক্ত; অন্যদিকে নিরয় অপার।

যার যেদিকে ভার সেদিকে প্রয়াণ,
কর্ম অনুযায়ী গতি নিয়তি বিধান।

তোমরা আপন কর্মে সংযত ও দায়িত্ববান হবে। নিজের দুঃখের জন্য অপর কাউকে দোষ দেবে না। অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। প্রতিদানে তোমাকে ভালোবাসবে। কাউকে ঘৃণা করবে না। সর্বদা সত্য ও ধর্মপথ অনুসরণ করবে।

আমরা সুন্দর জীবন গঠন করলে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারি। পুণ্যবান ও শীলবান ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে। এটা ধার্মিক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা থাকে। আর যারা কুকর্মে লিপ্ত হয় তারা সমাজে অবহেলিত ও নিন্দিত হয়। কুকর্মের ফল ইহজীবনে ভোগ করতে হয়। তাই কবি বলেছেন–

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর,
মানুষের মাঝে স্বর্গ–নরক মানুষেতে সুরাসুর।

সেজন্য বুদ্ধ চেতনাকে কর্ম বলেছেন। এ চেতনা কায়, বাক্য ও মনোদ্বারে সংঘটিত হয়। তাই কুশল চিত্ত উৎপন্ন করতে হয়। সৎচেতনা দ্বারা সৎকর্ম উৎপন্ন হয়। কর্ম ও কর্মফল জীবন প্রবাহের অবস্থামাত্র। তাই সুখের ক্ষেত্রে স্বর্গ, দেবলোক, ব্রহ্মলোক যেমন রয়েছে, তেমন দুঃখের ক্ষেত্রে রয়েছে তির্যক, প্রেত, অসুর, নরক ইত্যাদি।

এবার কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে তোমাদের দুটি নীতিগল্প বলব। একটি হচ্ছে পুণ্যবান ব্যক্তির কাহিনী এবং অন্যটি হচ্ছে পাপের পরিণাম। তোমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে।

শ্রাবস্তীতে একজন ধার্মিক উপাসক ছিলেন। তিনি সপরিবার সৎপথে জীবনযাপন করতেন। সৎকর্ম করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি সব সময় পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমীতে উপোসথ পালন করতেন। তাঁর গুণাবলি দেখে সবাই মুগ্ধ হতো। উপাসক বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, বাবা বিহারে যাও।

ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন কর, আমার ধর্মশ্রবণের ইচ্ছা হয়েছে। কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন। বুদ্ধ ভিক্ষু পাঠালেন। ভিক্ষুগণ উপাসকের বাড়িতে এসে পাশে বসে সূত্র পাঠ আরম্ভ করলেন। উপাসক একাগ্র মনে শুনছিলেন। এ সময় ছয় দেবলোক থেকে ছয়জন সারথি রথসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা স্ব স্ব দেবলোকের সুখের বর্ণনা দিয়ে উপাসককে রথে ওঠার অনুরোধ জানালেন। উপাসক সারথিকে বললেন– আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি ধর্মশ্রবণ করছি। ধর্মশ্রবণ শেষে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

'পাপের পরিণাম' সম্পর্কে কাহিনীটি নিম্নরূপ:

একদা মৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বাসস্থানের পাশে একটি বিরাট অজগর প্রেত বাস করত। তার শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল। স্থবির অজগরের অবস্থা দেখে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

মৃত্যুর পূর্বাহ্নে ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক ধার্মিক উপাসকের সূত্র শ্রবণ

মৌদ্গল্যায়ন স্থবির বেণুবন বিহারে এসে এ বিষয়ে বুদ্ধকে জানালেন। তখন বুদ্ধ স্থবিরকে এ প্রেতের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বললেন।

অজগর প্রেত কাশ্যপ বুদ্ধের সময় মানবকুলে জন্ম নিয়েছিল। সে অধার্মিক ছিল। দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাই সে দুর্বৃত্ত নামে পরিচিত হলো। তখন সুমঙ্গল

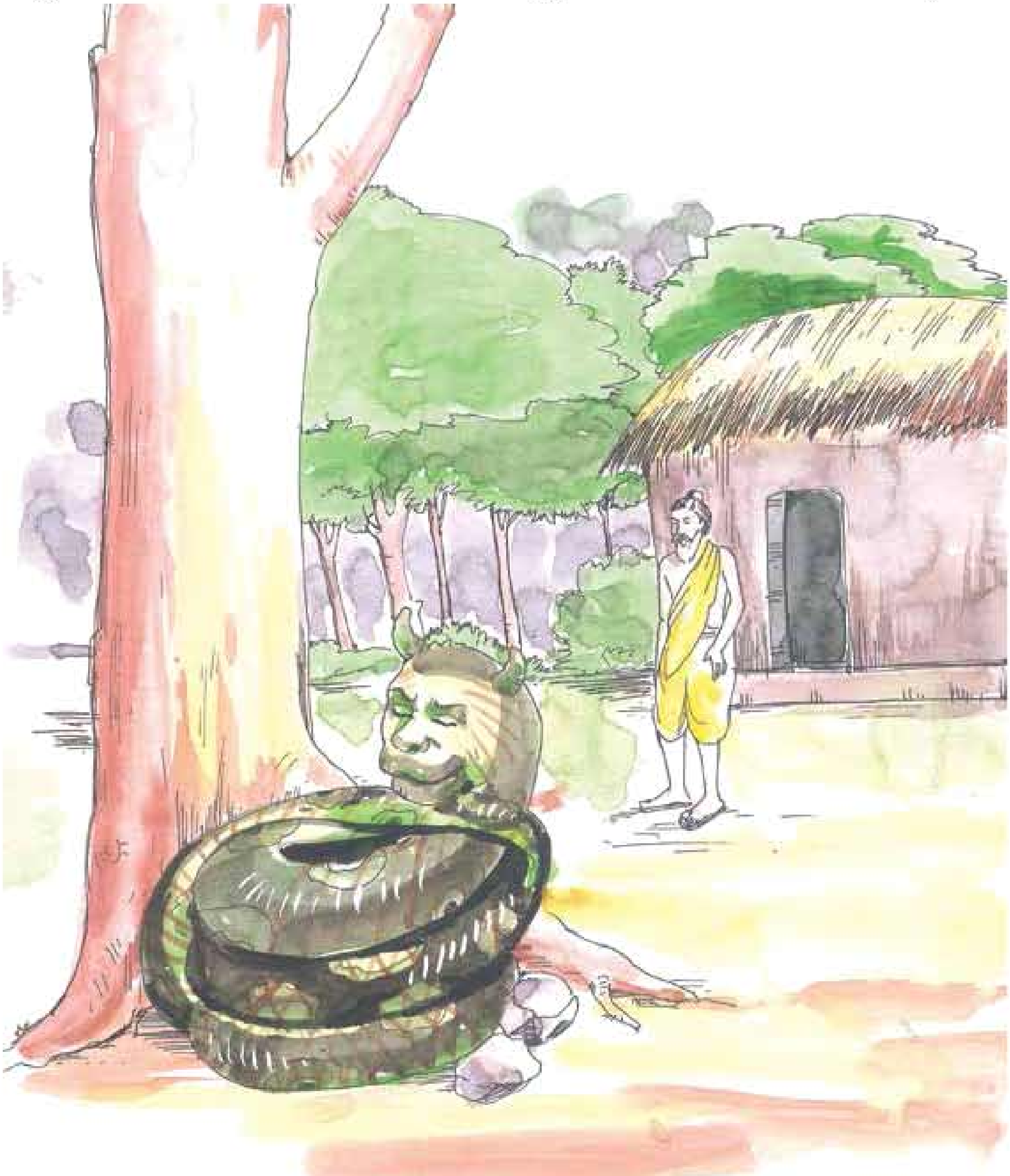

কষ্টরত অবস্থায় অজগর প্রেত, পাশে ছোট কুটিরের সামনে মৌদ্গল্যায়ন স্থবির দণ্ডায়মান

নামে এক শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। দুর্বৃত্ত শ্রেষ্ঠীর সবকিছু লুণ্ঠন করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সে পাপের ফলে অজগর প্রেতরূপে জন্ম নিয়ে অগ্নিদগ্ধ হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ উপদেশ স্বরূপ বললেন:

মূর্খ ব্যক্তি যখন পাপকর্ম করে তখন তা বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন সে দুষ্কর্মের ফলে নরকে গমন করে তখন অনুতাপ করে।

দেখ, সৎকর্মের ফল কী সুখাবহ। দুষ্কর্মের ফল কী ভয়াবহ। তোমরা সব সময় সৎকর্মে রত থাকবে। তাহলে ধর্মীয় ও আদর্শ জীবন গঠন করতে পারবে। কখনো খারাপ কাজ করবে না। সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। সত্যধর্ম অনুশীলন করবে। নিজেদের আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক প্রশ্নের উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি কী?

ক. দৃষ্টিবাদ খ. আত্মবাদ
গ. কর্মবাদ ঘ. ক্ষান্তিবাদ

২. বুদ্ধ চেতনাকে কী বলেছেন?

ক. কর্ম খ. ধর্ম
গ. জন্ম ঘ. ব্রহ্ম

৩. কোনটি দুঃখের ভোগাস্তি?

ক. স্বর্গ খ. নরক
গ. দেবলোক ঘ. ব্রহ্মলোক

৪. কোনটি দুষ্কর্মের অন্তর্গত?

ক. জরা, ব্যাধি খ. সুখ, আনন্দ
গ. জাতি, গোত্র ঘ. লোভ, দ্বেষ

২০২৫

৫. **ধার্মিক উপাসক কোথাকার ছিলেন?**

ক. রাজগৃহ　　খ. শ্রাবস্তী
গ. নালন্দা　　ঘ. বারণসী

৬. **মৌদ্গল্যায়ন স্থবির রাজগৃহের কোন পর্বতে অবস্থান করতেন?**

ক. তালকূট　　খ. গৃধ্রকূট
গ. চিরকূট　　ঘ. ন্যায়কূট

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কর্মের গতি .... ও বহুমুখী।
২. তাই খারাপ কাজকে .... কর্ম বলা হয়।
৩. ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য .... দ্বার খোলা থাকে।
৪. কর্ম ও কর্মফল জীবন .... অবস্থামাত্র।
৫. তখন বুদ্ধ স্থবিরকে এ প্রেতের .... বৃত্তান্ত বললেন।
৬. সৎ ও .... ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. প্রাণীগণ নিজ নিজ	১. নিজেই সুখ ভোগ করে।
২. খারাপ কাজ করলে	২. মানুষেতে সুরাসুর।
৩. নিজের সুকর্মের জন্য	৩. মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন।
৪. মূর্খ ব্যক্তি যখন পাপকর্ম করে,	৪. সবাই নিন্দা করে।
৫. মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক	৫. কর্মের অধীন।
৬. উপাসক বৃদ্ধ বয়সে	৬. তখন তা বুঝতে পারে না।
	৭. দেবলোকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

২০২০

ঘ. নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. কর্মবাদ কাকে বলে?
২. কুশল কর্ম বলতে কী বোঝ?
৩. খারাপ কাজকে কী বলা হয়?
৪. ধার্মিক উপাসক কখন উপোসথ পালন করতেন?
৫. মৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের বাসস্থানের পাশে কে বাস করত?
৬. কে দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. সুকর্ম ও দুষ্কর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
২. 'বৌদ্ধ কর্মবাদ' সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ।
৩. কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ফলাফল বর্ণনা কর।
৪. সুকর্ম ও কুকর্মের পদ্যাংশটি উদ্ধৃত কর।
৫. ধার্মিক উপাসকের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৬. অজগর প্রেতের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্য

ভগবান বুদ্ধ সারনাথে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সে সময় পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন। পরবর্তীতে যশ, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, উপালি, আনন্দ, অনুরুদ্ধ, সীবলী প্রমুখ ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁরা সবাই থের উপাধি লাভ করেন। পটাচারা, কৃশা গৌতমী, অনোপমা, পূর্ণিকা, উৎপলবর্ণা, আম্রপালি ছিলেন থেরীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

যিনি প্রবীণ ও মার্গফললাভী তাঁকে শ্রাবকশিষ্য বলা হয়। যিনি বয়সে ও জ্ঞানে বড় তিনি থের নামে অভিহিত। মহিলা ভিক্ষুণীকে থেরী বলা হতো। শুধুমাত্র ভিক্ষুজীবন যাপন করলেই প্রকৃত থের বা থেরী হওয়া যায় না। যিনি সত্য, ন্যায়, সচ্চরিত্র, অহিংসা, সংযম প্রভৃতি নিয়ম পালন করেন তিনিই প্রকৃত থের বা থেরী। পালি 'থের' শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে স্থবির।

যারা গার্হস্থ্য জীবন যাপনকারী উপাসক–উপাসিকা তারা গৃহীশিষ্য। গৃহী শিষ্যদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, অজাতশত্রু, জীবক, সম্রাট অশোক, কণিষ্কের নাম উল্লেখযোগ্য।

আনন্দ স্থবির

বুদ্ধের প্রধান সেবক ছিলেন আনন্দ। তাঁর পিতার নাম অমিতোদন। তিনি ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ভাই। মাতার নাম জনপদকল্যাণী। সদ্যোজাত শিশুর দর্শনে জ্ঞাতিগণ আনন্দিত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় 'আনন্দ'। সিদ্ধার্থ গৌতম যেদিন জন্মগ্রহণ করেন ঠিক সেদিন আনন্দও ভূমিষ্ঠ হন। খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দের শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিই ছিল উভয়ের জন্মলগ্ন। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের কথা শুনে শাক্যকুমারদের অনেকে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল অন্যতম। একথা শুনে দেবদহের রাজপুত্র দেবদত্ত এবং রাজকুলের নাপিত বংশধর উপালিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। তখন বুদ্ধ অনুপ্রিয় আম্রকাননে অবস্থান করতেন। তাঁরা এক সঙ্গে বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন।

রাজপুত্র আনন্দ ছিলেন ক্ষৌরকার উপালির চেয়ে বয়সে বড়। বুদ্ধ জাতিভেদের বিপক্ষে ছিলেন। তাই তিনি উপালিকে সর্বপ্রথমে প্রব্রজ্যা দেন। বয়সে যত বড় হোক

২০২০

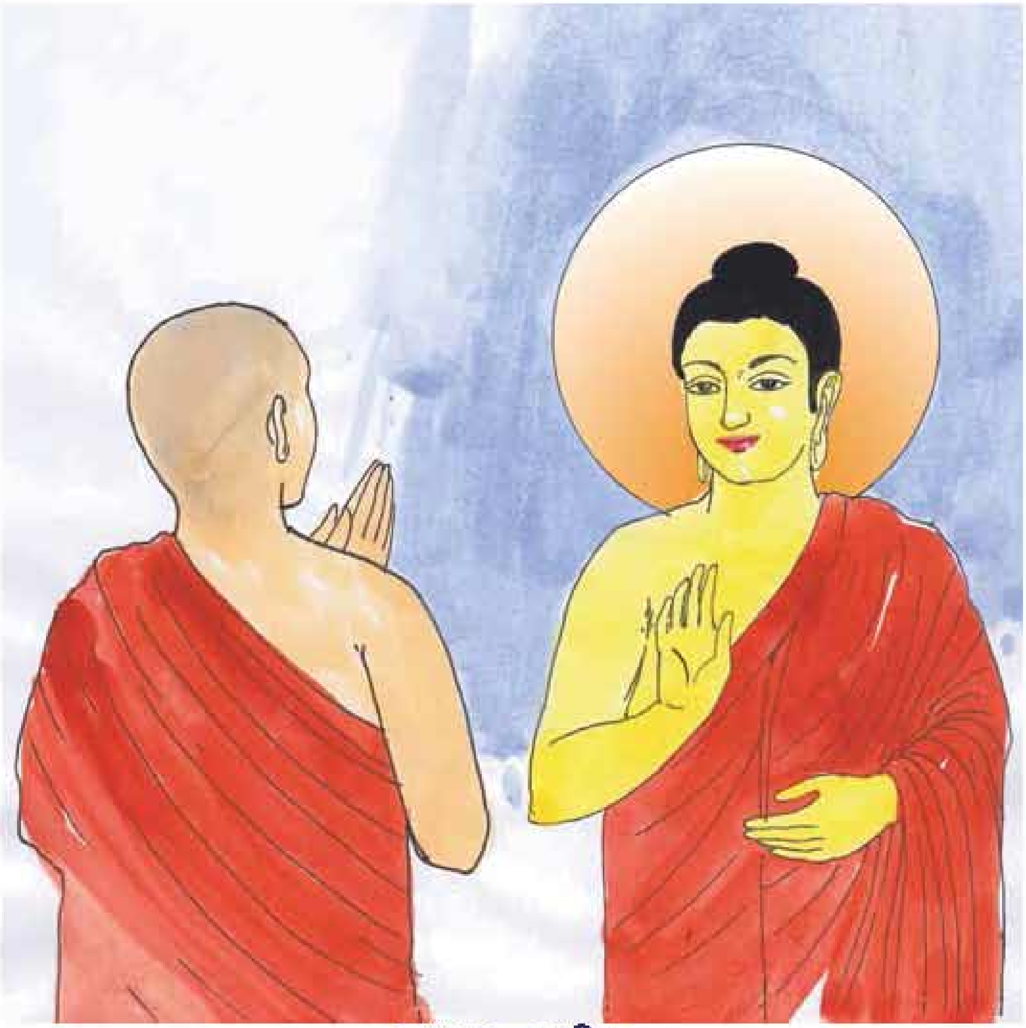

বুদ্ধ ও আনন্দ স্থবির

না কেন, যিনি আগে প্রব্রজিত হন, তাঁকে প্রণাম করতে হয়।

তখন বুদ্ধের কোনো ব্যক্তিগত সেবক ছিলেন না। তাই আনন্দ ৮টি শর্তে বুদ্ধের প্রধান সেবক নিযুক্ত হন। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. বুদ্ধ নিজের প্রাপ্ত চীবর যেন তাঁকে না দেন।
২. স্বীয় লব্ধ অন্ন যেন তাঁকে না দেন।
৩. গন্ধকুটির বিহারে যেন থাকতে না বলেন।
৪. বুদ্ধ তাঁর গৃহীত নিমন্ত্রণে যেন যান।

৫. নিমন্ত্রণে যেন তাঁকে নিয়ে না যান।
৬. বুদ্ধের নিকট কেউ দেখা করতে চাইলে তিনি যেন দেখা দেন।
৭. যখন তাঁর কোনো বিষয়ে সন্দেহ হবে তখন বুদ্ধের নিকট যেন উপস্থিত হতে পারেন।
৮. তাঁর অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করলে তা যেন তাঁকে বলেন।

আনন্দ ছিলেন জ্ঞানী, পণ্ডিত, স্মৃতিধর। বুদ্ধের দেশিত বাণী তিনি স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি প্রথম সংগীতিতে সমগ্র ধর্ম অর্থাৎ সূত্র ও অভিধর্ম আবৃত্তি করেছিলেন। তাঁরই একান্ত অনুরোধে মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ বহু শাক্যনারীকে ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাই তিনি ধর্মভান্ডারিক নামে খ্যাত ছিলেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরও আনন্দ ৪০ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ১২০ বছর বয়সে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

অনুরুদ্ধ স্থবির

স্থবির অনুরুদ্ধের পূর্বজন্মের একটি সুন্দর কাহিনী আছে। তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর পর বারাণসীর এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় অন্নভার। সে সময় তিনি সুমন শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে চাকরি করতেন। একদিন তাদের জন্য তৈরি সব খাদ্য একজন পচ্চেক বুদ্ধকে দান করেন। পচ্চেক বুদ্ধ তাদের আশীর্বাদ করলেন। শ্রেষ্ঠী সুমন অন্নভারের নিকট পুণ্যভাগ দিতে অনুরোধ করলেন। অন্নভার তাঁকে পুণ্যদান করলেন। এতে শ্রেষ্ঠী খুশি হয়ে তাঁকে অনেক টাকা পুরস্কার দিলেন।

একদিন শ্রেষ্ঠী সুমন রাজদর্শনে গেলেন। সাথে অন্নভারও ছিলেন। এ সময় রাজা পুণ্যবান অন্নভারকে এক হাজার টাকা পুরস্কৃত করেন। বাড়ি নির্মাণের জন্য জায়গা দিলেন। সে জায়গা আবাদ করার সময় মাটির নিচে অনেক টাকা পান। এজন্য রাজা তাঁর নাম রাখলেন ধনশ্রেষ্ঠী। তিনি যথাসময়ে দেহত্যাগ করলেন।

মৃত্যুর পর ধনশ্রেষ্ঠী গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলাবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় অনুরুদ্ধ। পিতার নাম ছিল অমিতোদন শাক্য। দুঃখময় জীবনে তাঁর এ সুখ বেশিদিন ভালো লাগল না। তিনি সারিপুত্র স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি সাধনা করতে লাগলেন। পরে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্বফল লাভ করেন।

দান দিলে পুণ্য হয়। পুণ্য প্রভাবে ইহ ও পরজন্মে ধন লাভ হয়। সৎকাজে ব্যয় করলে

অনুরুদ্ধের জমি চাষ করতে গিয়ে ধনের সন্ধান লাভ করেন

প্রভৃত মঙ্গল সাধিত হয়। পুণ্যকর্ম পারমী পূরণে সাহায্য করে। অনুরুদ্ধ স্থবিরের জীবন সাধনা সকলের জন্য শিক্ষণীয়।

উৎপলবর্ণা

এ নারী পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল সম্ভ্রান্ত। তিনি প্রাপ্ত বয়সে বুদ্ধের উপদেশ শুনে আনন্দিত হলেন। তখন বুদ্ধ জনৈক ভিক্ষুণীকে ঋদ্ধিবান হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন। তা দেখে উক্ত নারীর ঐ পদ লাভের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সাত দিনব্যাপী দান দিয়েছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেহ নীল পদ্মের মতো ছিল। তাই তাঁকে উৎপলবর্ণা বলা হতো। প্রাপ্ত বয়সে সমগ্র ভারত থেকে তাঁর বহু

বিবাহপ্রার্থী আসল। সকলের ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাঁর পিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সংসার ত্যাগ করতে আগ্রহী কি না'? শ্রেষ্ঠীকন্যা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আমি এখনই প্রস্তুত। তিনি কন্যাকে ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য ভিক্ষুণীদের নিকট নিয়ে গেলেন। কন্যা সেখানে ভিক্ষুণী হলেন। পরে সাধনার বলে অর্হত্বফল লাভ করেন।

তারপর জেতবনের সংঘ সম্মেলনে বুদ্ধ তাঁকে ঋদ্ধিবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বহু গাথা ভাষণ করেন। গাথার একটি অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো :

> তৃষ্ণা মানুষকে শূলের মতো বিদ্ধ করে। তোমার কাছে যা ভোগের আনন্দ, আমার কাছে তা অল্পমাত্র।

তৃষ্ণার বশীভূত হলে মানুষের ক্ষতি হয়। তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। সৎকর্মেরত থাকবে।

পূর্ণিকা

বিপস্‌সী বুদ্ধের সময় পূর্ণিকা এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের নিকট ধর্মোপদেশ শোনেন। পরে ভিক্ষুণী হন। নিয়মিত শীল পালন করতেন। ত্রিপিটক অধ্যয়ন করে বুদ্ধবাণী অনুশীলন করতেন। ফলে তিনি ধর্মের শিক্ষয়িত্রী হলেন। পরবর্তীকালে তিনি আরও পাঁচজন বুদ্ধের নিকট একই পদ লাভ করেন। এজন্য তিনি অভিমান করতেন। এ কর্মফলের দরুণ গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরে দাসীর গৃহে জন্ম নেন। তাঁর পিতা ছিল অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠীর কৃতদাস। তাই তিনি দাসীকন্যা রূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ধর্মোপদেশ শুনে স্রোতাপন্ন হন। পরে উদকশুদ্ধিক নামে এক ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। ঐ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সকালে পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীতে স্নান করতেন। তাই পূর্ণিকা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন: 'ব্রাহ্মণ, তুমি কেন নদীতে স্নান করছ'?

ব্রাহ্মণ বললেন, 'পূর্ণিকা, আমি পাপকর্মের ফল মোচনের জন্য সৎকর্ম করছি'। স্নানশুদ্ধির দ্বারা পাপমুক্ত হয় তা তোমাকে কে বলেছে? যদি তাই হতো, তাহলে ব্যাঙ, কচ্ছপ, কুমির স্বর্গে যেত। স্নান করলে পুণ্য সঞ্চয় হয় না। পুণ্য সঞ্চয় করতে হলে দান, শীল, ভাবনায় রত থাকতে হয়।

একথা শুনে ব্রাহ্মণ বললেন: পূর্ণিকা, আমি কুমার্গে পতিত হয়েছিলাম। তুমি আমাকে

আর্যমার্গ প্রদর্শন করেছ। আমি পূর্বে নামেমাত্র ব্রাহ্মণ ছিলাম। এখন আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হলাম।

ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করছেন, কূলে পূর্ণিকা

এরূপ বলে ব্রাহ্মণ বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের শরণ গ্রহণ করলেন। শীল পালনে ব্রতী হলেন। উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণের সুখ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হলো। তা শুনে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী পূর্ণিকার পিতাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। পূর্ণিকা সংঘে প্রবেশ করে অচিরেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তোমরাও আর্যমার্গ অর্থাৎ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন করবে। সৎকর্মে নিজের জীবনকে গড়ে তুলবে। তাহলে সুখী হতে পারবে।

রাজা বিম্বিসার

বুদ্ধের সময় মগধ ও কোশল– এ দুটি রাজ্য শক্তিশালী ছিল। বিম্বিসার মগধের এবং মহাকোশল কোশলের রাজা ছিলেন। রাজা বিম্বিসার মহাকোশলের কন্যাকে বিয়ে করেন। কন্যার বিয়ের সময় মহাকোশল বিম্বিসারকে কাশীগ্রাম উপহার দেন। অজাতশত্রু ছিলেন বিম্বিসারের পুত্র।

সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করে প্রথমে মগধে যান। তখন রাজা বিম্বিসারের সাথে তাঁর দেখা হয়। বুদ্ধত্ব লাভের পর আগমন করবেন বলে সিদ্ধার্থ রাজাকে কথা দিয়েছিলেন। তাই বুদ্ধ সারনাথ থেকে রাজগৃহে গিয়ে বিম্বিসারকে দীক্ষা দেন।

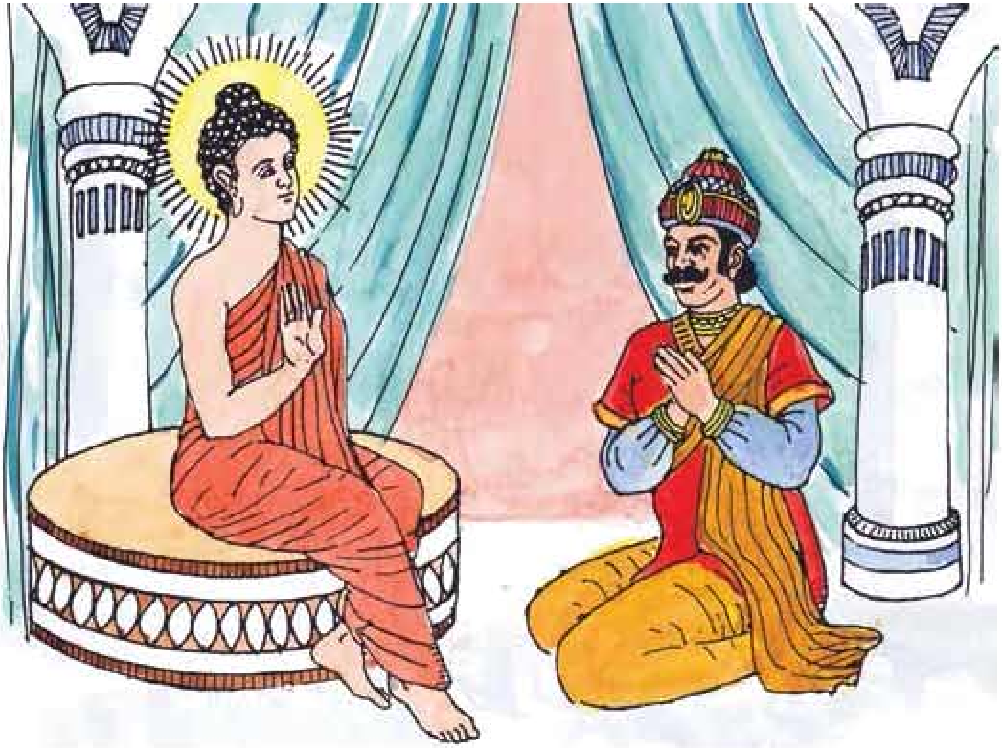

বুদ্ধের নিকট রাজা বিম্বিসারের দীক্ষা গ্রহণ

রাজা বিম্বিসারের স্ত্রী গর্ভবতী হন। রানি যথাসময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তাঁর নাম রাখা হলো অজাতশত্রু। রাজকীয় পরিবেশে ষোল বছর বয়সে তাঁকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত করলেন। পিতা বিম্বিসার অজাতশত্রুকে সিংহাসনে বসালেন। কিন্তু অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করে কারাগারেই রাখলেন। রাজা বিম্বিসার কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

বুদ্ধের প্রতি বিম্বিসারের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে ধর্মের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সদ্ধর্মের একজন খাঁটি ধার্মিক উপাসক। তাঁকে অনুসরণ করে অনেক লোক তথাগত বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবন বিহারে ১৯ বর্ষা যাপন করেন। বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচার জীবনে রাজা বিম্বিসারের অবদান সব চেয়ে বেশি।

রাজবৈদ্য জীবক

জীবক ছিলেন ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক। রাজকুমার অভয় ছিলেন তাঁর পিতা। মাতা ছিলেন শালবতী। কথিত আছে, শালবতী তাঁকে প্রসব করার পরই অরণ্যে ফেলে দেন। রাজকুমার অভয় তাকে নিজ গৃহে নিয়ে লালনপালন করেন। জীবক একদিন কুমার অভয়কে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আমার মা কে? অভয় বললেন, বৎস, তোমার মা কে তা আমি জানি না। তোমাকে বনের মধ্য থেকে কুড়িয়ে এনেছি। আমি লালনপালন করেছি মাত্র। জীবক বুঝলেন, সে কুমার অভয়ের পুত্র নয়। তাই তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য

বুদ্ধের চিকিৎসক রাজবৈদ্য জীবক

২০২০

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শিক্ষা লাভের জন্য তক্ষশিলায় গেলেন। তথায় একজন আচার্যের নিকট গিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমাকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিন। জীবকের ব্যবহারে আচার্য মুগ্ধ হলেন। আচার্য খুশি হয়ে জীবককে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগলেন। জীবক অল্প সময়েই শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

একদিন আচার্য জীবককে বললেন, 'আমি তোমাকে চার দিন সময় দিলাম। তুমি এ নগরের চারদিকে ঘুরে এস। কোন গাছটি ঔষধের কাজে লাগে না, তা এনে দেখাবে।' জীবক আচার্যের আদেশমতো নগরের চারদিকে ঘুরলেন। কিন্তু কোথাও কোনো গাছ দেখলেন না, যা ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত নয়। তিনি আচার্যকে একথা জানালেন। আচার্য বললেন, তোমার বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়েছে। আর কিছু করণীয় নেই। তুমি নিজ দেশে ফিরে গিয়ে কর্তব্য সম্পাদন কর।

জীবক দেশে ফেরার পথে সাকেত নগরে উপস্থিত হলেন। সে নগরে এক ধনী মহিলার শিরঃপীড়া ভালো করে অনেক টাকা পেলেন। রাজগৃহে ফিরে গিয়ে কুমার অভয়ের পুত্র হিসেবে বাস করতে লাগলেন। তিনি বুদ্ধের স্থায়ী চিকিৎসক ছিলেন এবং রাজবৈদ্য হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বুদ্ধের প্রধান সেবক কে ছিলেন?

ক. মহাকাশ্যপ　　খ. আনন্দ
গ. উপালি　　ঘ. যশ

২. আনন্দ কয়টি শর্তে বুদ্ধের সেবক নিযুক্ত হয়েছিলেন?

ক. ১০টি　　খ. ১৫টি
গ. ৮টি　　ঘ. ২৫টি

৩. অনুরুদ্ধ স্থবিরের পিতার নাম কী ছিল?

ক. শুদ্ধোদন খ. ধৌতদন
গ. অমিতোদন ঘ. শুক্লদন

৪. উৎপলবর্ণা পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কোন নগরে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. কপিলাবস্তু খ. শ্রাবস্তী
গ. কংসবতী ঘ. হংসবতী

৫. বিম্বিসার কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?

ক. কোশল খ. মগধ
গ. পাটলিপুত্র ঘ. উজ্জয়নী

৬. রাজবৈদ্য জীবকের মাতার নাম কী?

ক. শালবতী খ. লীলাবতী
গ. লজ্জাবতী ঘ. অমরাবতী

৭. জীবকের আচার্য তাঁকে ঔষধের কাজে লাগে না এমন গাছ আনার জন্য কয় দিন সময় দিয়েছিলেন?

ক. এক দিন খ. দুই দিন
গ. তিন দিন ঘ. চার দিন

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. সে সময় পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা .... দীক্ষা নেন।
২. মহিলা ভিক্ষুণীদের .... বলা হতো।
৩. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরও আনন্দ .... বছর জীবিত ছিলেন।
৪. তাঁর দেহ নীল .... মতো ছিল।
৫. সিদ্ধার্থ গৌতম .... করে প্রথমে মগধে যান।
৬. তুমি এ নগরের .... ঘুরে এস।

২০২১

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সে সময় পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা	১. রাজদর্শনে গেলেন।
২. তাই তিনি উপালিকে	২. আশীর্বাদ করলেন।
৩. পচ্চেক বুদ্ধ তাদের	৩. রাখলেন ধনশ্রেষ্ঠী।
৪. একদিন শ্রেষ্ঠী সুমন	৪. কন্যাকে বিয়ে করেন।
৫. এজন্য রাজা তাঁর নাম	৫. ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন।
৬. রাজা বিম্বিসার মহাকোশলের	৬. সর্বপ্রথম প্রব্রজ্যা দেন।
	৭. গৃহত্যাগ করেন।

ঘ. নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. দুইজন থের–থেরীর নাম লেখ।
২. শ্রাবকশিষ্য কাকে বলে?
৩. বুদ্ধের প্রধান সেবক কে ছিলেন?
৪. পূর্ণিকা কোন বুদ্ধের সময় সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?
৫. রাজা বিম্বিসার কার কন্যাকে বিয়ে করেন?
৬. জীবক আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. আনন্দ স্থবিরের জীবনী আলোচনা কর।
২. অনুরুদ্ধ স্থবিরের পূর্বজন্মের কাহিনীটি বর্ণনা কর।
৩. উৎপলবর্ণার সংসার ত্যাগের কারণ লেখ। তিনি কীভাবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন?
৪. পূর্ণিকা কে ছিলেন? পূর্ণিকা ও উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণের কথোপকথনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
৫. রাজা বিম্বিসারের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬. চিকিৎসাশাস্ত্রে জীবকের ভূমিকা আলোচনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

জাতকের শিক্ষা

জাতক

সাধারণ অর্থে জাতক বলতে যে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে বোঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতক শব্দটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম বৃত্তান্তকে জাতক বলা হয়। এককথায় জাতক বুদ্ধের পূর্বজন্মের বিচিত্র কথা ও কাহিনী।

বুদ্ধ ধর্ম দেশনা কালে উদাহরণ স্বরূপ জাতক কাহিনীগুলো বলতেন। বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর রূপে তিনি অনেক ভালো ভালো কাজ করেছিলেন। অনেক কুশল কর্ম করে শেষ জন্মে পূর্ণজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করে বুদ্ধ হন।

পালি সাহিত্যে জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি। জাতক পালি ভাষায় রচিত। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্ত পিটকের খুদ্দক নিকায়ের একাদশ গ্রন্থ হলো জাতক ।

জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা

জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা সর্বজনীন। জাতক কাহিনীগুলো অতি চমৎকার। সদাচরণ, জীবে দয়া, মৈত্রী, করুণা, মহানুভবতা, সাধুতা, নৈতিকতা, সেবা, শিষ্টাচার, সংযম, মানবতা ইত্যাদি জাতক সাহিত্যের উপদেশ। কুশল কর্ম বা পথ অবলম্বন করে মহৎ ও আদর্শ জীবন গঠন করা জাতকের মূল শিক্ষা।

বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দানের সময় জাতকের নানা কাহিনীর বর্ণনা করতেন। জাতকের ঘটনাগুলো বোধিসত্ত্ব জীবনের সময়কালের। বোধিসত্ত্বের নানা জন্ম ও পারমী পূরণের অবিচল প্রচেষ্টার কথাই জাতকের শিক্ষা। জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা মানুষের জন্য মণিরত্নের মতো।

জাতকের উপদেশ মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী, করুণা আর ভালোবাসার বন্ধন ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে। এগুলো মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। জাতকের উপদেশের মধ্যে মানুষের জীবনাচার, পেশা এবং সমাজের অসংগতি ধরা পড়ে। ন্যায়–অন্যায় বোধ জাগ্রত করা এবং কুসংস্কার পরিহার করা জাতকের শিক্ষা।

জাতক পাঠের উদ্দেশ্য

জাতক পাঠে অনেক কিছু জানা যায়। সাধারণত সৎ কাজের সুফল ও অসৎ কাজের কুফল বর্ণনা করাই জাতকের উদ্দেশ্য। বৌদ্ধধর্ম মতে, এক জন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারে না। গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর রূপে অসংখ্য কল্পকাল ধরে নানা কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল জন্মে দান, শীল, মৈত্রী, সেবা, কুশল কর্ম সম্পাদনের দ্বারা পারমী পূরণ করে বুদ্ধ হন। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের সৎকর্ম, ভালো-মন্দ জানার উদ্দেশ্যে জাতক বলতেন। মৈত্রী সাধনা ও কুশলকর্ম বোধিসত্ত্ব জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ। জাতক পাঠ মূলত শিষ্য ও প্রশিষ্যদের সঠিক পথে চলা, ভালো কাজ করা, সমাজ জীবন, পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি, পরোপকার করা, ন্যায়পরায়ণ হওয়া ইত্যাদির শিক্ষা পাওয়া যায়। বিশেষ করে তাঁদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে নির্বাণের পথে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা লাভ করা।

জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য

জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সকলের কাছে জাতক পাঠ গুরুত্ব লাভ করেছে। জাতকের প্রভাব সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যমান। প্রাচীন কালের ঈশপের গল্প ও ডেকামেরনে জাতকের প্রভাব পাওয়া যায়। আরব্য রজনীর কাহিনীতেও জাতকের প্রভাব রয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে জাতকের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। যেমন- বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এমনকি ইহুদি সাহিত্য ও বাইবেলেও জাতকের প্রভাব রয়েছে।

জাতকের ঐতিহাসিক মূল্য অত্যধিক। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান জাতকে রয়েছে। আড়াই হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজ্যশাসন প্রণালি, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি জাতকে বর্ণিত আছে। জাতক সাহিত্যে বিভিন্ন রাজ্য, নগর, বন্দর, রাজন্যবর্গ, শ্রেণি, বণিক, বিহার, নদ-নদী প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- কোশল, বৈশালী, মগধ, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বারাণসী প্রভৃতি। আবার রাজাদের মধ্যে প্রসেনজিৎ, বিম্বিসার, উদয়ন, অজাতশত্রু প্রমুখ রাজার নাম পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠী ছিলেন ধনঞ্জয়, অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ। জাতকের নানা দিক বিবেচনা করে ভিনসেন্ট স্মিথ, রিসডেভিড, ফৌসবল প্রমুখ ইতিহাসবিদ, পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম রত্নভাণ্ডার বলে

অভিহিত করেছেন। তাই বলা যায় জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

জাতক সাহিত্যের আলোকে তোমরা এবার কয়েকটি জাতক কাহিনী এবং উপদেশ সম্পর্কে জানতে পারবে।

মহাধর্মপাল জাতক

প্রাচীন কালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তখন কাশীরাজ্যে ধর্মপাল নামে একটি গ্রাম ছিল। এই গ্রামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি ছিলেন দশ কুশল ধর্ম আচরণকারী। তাঁকে লোকে বলত ধর্মপাল। তাঁর পরিবারের সব লোক ও দাস-দাসীরা পর্যন্ত দানশীলপরায়ণ ছিলেন। তাঁরা শীল ও উপবাস ব্রত পালন করতেন।

বোধিসত্ত্ব এই বংশে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হলো ধর্মপাল কুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁর পিতা তাঁকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় এক আচার্যের কাছে পাঠালেন। আচার্যের পাঁচশত শিষ্য ছিল। ক্রমে বোধিসত্ত্ব সেই সব শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

একদিন আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের তরুণ বয়সে মৃত্যু হলো। আচার্য, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ছাত্ররা সকলে কান্না করতে লাগলেন। একমাত্র ধর্মপাল কুমার বোধিসত্ত্ব রোদন করলেন না। তিনি শুধু হাসলেন।

আচার্য ধর্মপালকে হাসার কারণ কী জানতে চান। তখন ধর্মপাল বলল, তাঁর বংশে কেউ তরুণ বয়সে মারা যায় না। এ কথার সত্যতা জানতে আচার্য একদিন একটি মৃত ছাগলের অস্থি নিয়ে ধর্মপালের বাড়ি গেলেন। ধর্মপাল মারা গেছে বলে আচার্য তাঁর পিতাকে বলল। কিন্তু ধর্মপালের পিতা বিশ্বাস করলেন না। তখন আচার্য ছাগলের অস্থি দেখিয়ে বলল, এ অস্থি ধর্মপালের। ধর্মপালের পিতা কোনোভাবে বিশ্বাস করল না। তখন আচার্য সত্যতা স্বীকার করল।

আচার্য এবার প্রসন্ন হয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্র জীবিত আছে। সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং তারই ওপর আমার অন্য শিষ্যদের বিদ্যাশিক্ষার ভার দিয়ে আমি এখানে এসেছি। আপনার পুত্র আমাকে বলেছে, আপনার বংশে তরুণ বয়সে কারো মৃত্যু হয় না। আমি এখন আপনার কাছে তার কারণ জানতে চাই। এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ যে যে গুণের প্রভাবে তাঁর বংশে অকাল মৃত্যু হয় না তার গুণগুলো বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, আমরা সৎ ও অসৎ ধর্মের কথা শুনে কখনো আসক্ত হই না। অসৎকে ত্যাগ করে, সদা সর্বদা সৎ এর ভজনা করি। তাই আমাদের বংশে তরুণ বয়সে কারো মৃত্যু হয় না।

২০২৫

দানের পূর্বে আমাদের মন সুপ্রসন্ন থাকে। প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করি। দানের পর আমরা কোনো অনুতাপ করি না। তাই তরুণের মরণ হয় না। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, পথিক, যাচক, দরিদ্র, ভিখারি, দ্বারস্থ হলে তাদের আহার ও পানাহারে তুষ্ট করি। সাধ্যমতো তাদের দান করি।

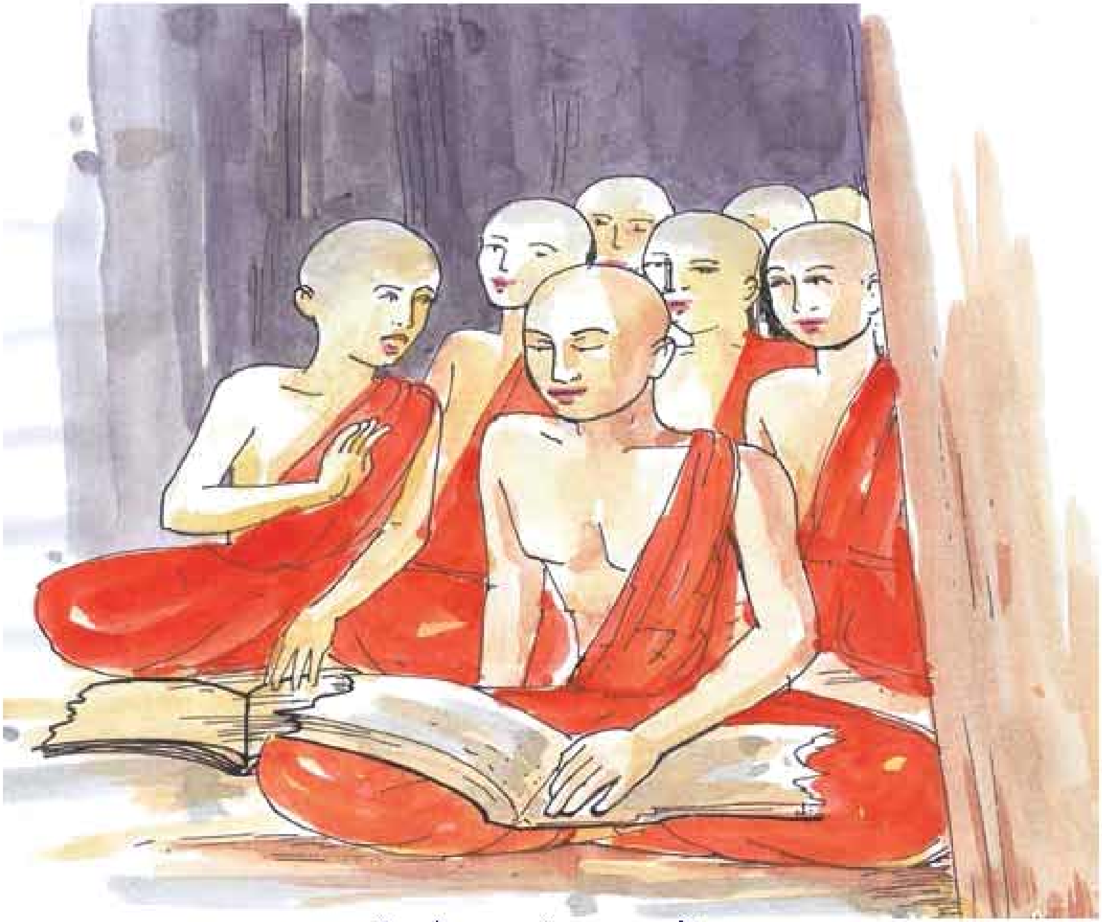

আচার্যের পাঠশালায় ধর্মপাল ও সহপাঠীবৃন্দ

আমাদের বংশের স্বামীরা সতীব্রত, স্ত্রীরা পতিব্রতা। সমগুণে ব্রহ্মচর্য পালন করি। এ বংশের সতী স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মায় সে মেধাবী, ধার্মিক, প্রজ্ঞাবান, সর্বশাস্ত্রবিদ ও দেবপরায়ণ হয়। মৃত্যুর পর সদ্‌গতি লাভের আশায় সকলেই ধর্মপথে বিচরণ করে। যে দাস-দাসী আশ্রিত আছে তারাও ধর্মপথে চলে।

এরপর ব্রাহ্মণ বললেন, যে ধর্মপথে চলে, ধর্মই তাকে রক্ষা করে। বর্ষা ও রৌদ্রে ছাতা

যেমন মানুষকে রক্ষা করে তেমনি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ধর্ম রক্ষা করে। ধার্মিকের কখনো অকল্যাণ হয় না। তাই বলি আপনি যে অস্থি এনেছেন, তা অন্য কারো। আমার পুত্রের তরুণ বয়সে মৃত্যু হতে পারে না। এ কথা শুনে আচার্য পরমপ্রীত হয়ে ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলেন, আমি আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য ছাগ অস্থি এনেছিলাম। আপনার পুত্র সুস্থ আছে। এখন আপনি যে ধর্ম রক্ষা করেন সেই কথাগুলো অনুগ্রহ করে বলুন।

আমরা আর্যধর্ম পালন করি, চার আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ, ব্রহ্মবিহার, উপোসথ ব্রত, পঞ্চশীল পালন করি। আচার্য কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে তক্ষশিলায় ফিরে গেলেন। তারপর ধর্মপাল কুমারকে সমস্ত বিদ্যা দান করে তাকে বহু অনুচরসহ গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

উপদেশ : ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ধর্ম রক্ষা করে।

নক্ষত্র জাতক

প্রাচীনকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তাঁর রাজত্বকালে এ জাতকের ঘটনাটি ঘটেছিল। বারাণসী নগরের লোকেরা তাদের এক পাত্রের সাথে জনৈক গ্রামবাসীর মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করলেন। আজীবক নামে নগরবাসীদের এক কুলগুরু ছিলেন। তাঁর নিকট গিয়ে নগরবাসীরা বলল, প্রভু, আজ আমাদের একটি শুভ কাজ আছে।

বরপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে বিবাহ লগ্নের শুভ–অশুভ নিয়ে বিতর্ক

২০২০

এখানকার এক কুলপুত্রের সাথে এক গ্রামবাসী মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। নক্ষত্র লগ্ন শুভ হবে কি? আজীবক মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। ভাবলেন, বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে এরা লগ্ন শুভ কি না জানতে এসেছে। আগে জানার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই বিয়ের অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্য বললেন, আজ নক্ষত্র লগ্ন মোটেই শুভ নয়। বিয়ে সম্পন্ন হলে অমঙ্গল হবে। নগরবাসীরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে ঐদিন পাত্রী আনতে গেল না।

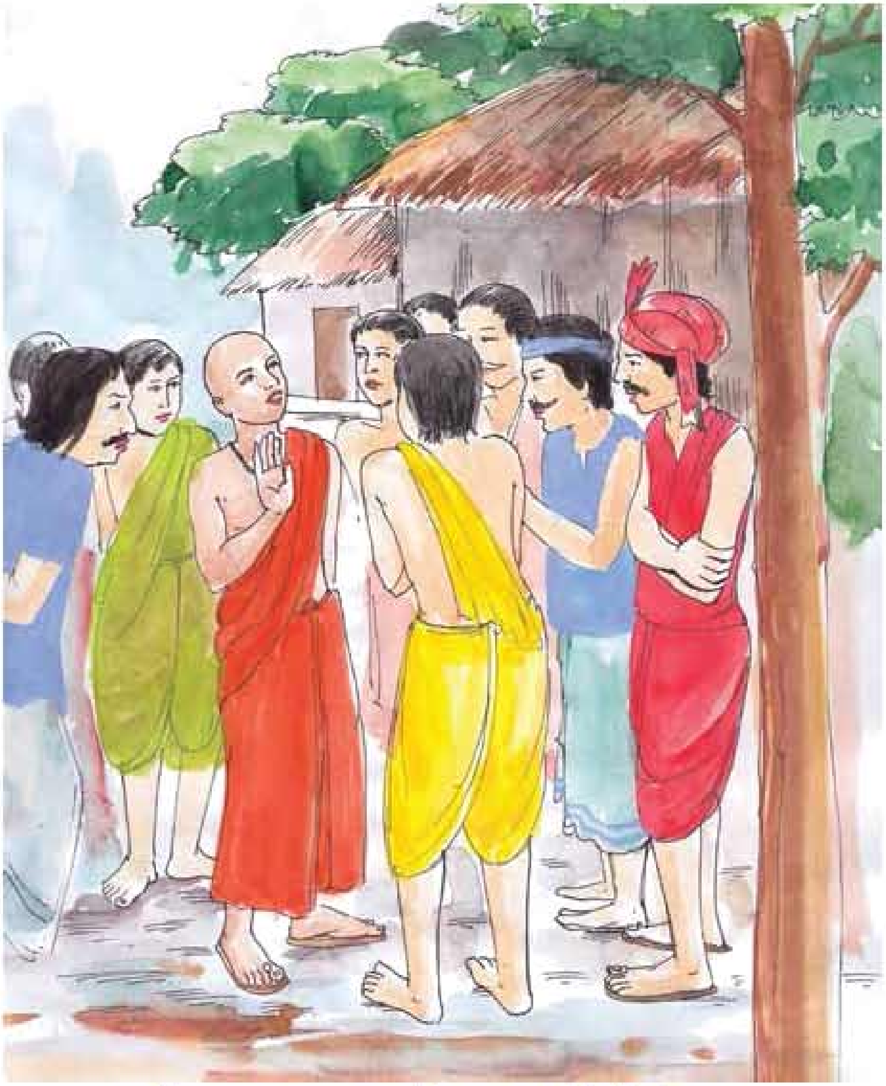

বোধিসত্ত্ব এসে বরপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে বিতর্ক মেটাচ্ছেন

এদিকে গ্রামবাসীরা সারাদিন অপেক্ষা করল। রাত হয়ে এলো। তবু বরযাত্রীদের দেখা নেই। উপায় না দেখে তারা রাতের মধ্যে অন্য বরের সাথে কনের বিয়ে দিয়ে দিল।

পরদিন পাত্রপক্ষ কন্যা আনতে গেলে ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে গ্রামবাসীরা বলল, তোমরা নগরবাসীরা বড়ই নির্লজ্জ। দিনক্ষণ সব ঠিক করে গতকাল পাত্রী নিতে এলে না। তাই আমরা অন্য পাত্রের সাথে কন্যা সম্প্রদান করেছি। এখন সেই বিবাহিত মেয়ে এনে তোমাদের দেওয়া সম্ভব নয়। তোমরা ফিরে যাও।

বরপক্ষ বলল, আমাদের কুলগুরু আজীবকের নিকট জানলাম, গতকাল নক্ষত্র লগ্ন শুভ ছিল

২০২০

না। বিয়ে হলে অমঙ্গল হবে। এজন্য আমরা আসিনি। এখন পাত্রী না নিয়ে ফিরে যাব কেন?

এভাবে উভয়পক্ষে তর্ক–বিতর্ক চলছিল। পাশে দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্ব সব শুনছিলেন। তিনি বললেন, নক্ষত্র লগ্ন শুভ কি অশুভ তাতে কি এসে যায়? মূর্খরাই নক্ষত্র লগ্ন শুভ অশুভ চিন্তা করে বসে থাকে। যথাসময়ে কাজ সম্পাদন করে সুফল অর্জনই শুভ লক্ষণ। শুভ কাজে নক্ষত্রের কোনো যোগ নেই। নক্ষত্র মেনে চলতে গেলে নিজেদেরই কাজের ক্ষতি হয়। যেমন– বরপক্ষের ক্ষতি হলো।

বোধিসত্ত্বের উপদেশ শুনে উভয়পক্ষ শান্ত হলো। বরপক্ষ পাত্রী ছাড়া বিষণ্ন মনে নগরে ফিরে গেল।

উপদেশ : শুভ কাজের কোনো কালাকাল নেই।

কূটবাণিজ জাতক

সুদূর অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল ‘পণ্ডিত’। বড় হয়ে ‘অতিপণ্ডিত’ নামে বণিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যবসা শুরু করেন। তাঁরা দুজনে পাঁচশ পণ্য বোঝাই গাড়ি নিয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যান। ক্রয়–বিক্রয় করে অনেক লাভবান হন। কিছুদিন পর বারাণসী নগরে ফিরে আসেন।

ব্যবসায় লভ্যাংশ নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। অতিপণ্ডিত বললেন, আমি দুই ভাগ নেব, তুমি এক অংশ পাবে। পণ্ডিত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? পণ্যের মূল্য, গাড়ি, বলদ সবকিছু আমরা দুজনে সমান দিয়েছি। উত্তরে অতিপণ্ডিত বললেন, তুমি শুধু পণ্ডিত বলে এক ভাগ, আর আমি অতিপণ্ডিত দুই অংশ। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হলো। অবশেষে অতিপণ্ডিত মীমাংসার একটি উপায় বের করলেন। কিন্তু এটা ছিল তাঁর দুষ্টবুদ্ধি। তিনি তাঁর পিতাকে এক বৃক্ষের কোটরে রাখলেন। বললেন, আমরা দুজনে এসে কে কত ভাগ পাব জিজ্ঞাসা করব।

একসময় তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হয়ে বৃক্ষদেবতার প্রশংসা করে বললেন, ঐ বৃক্ষদেবতা ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারেন।

তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করা হয় তা লাভ করা যায়। কোনো বিবাদ দেখা দিলে তাও মীমাংসা

করতে পারেন। বৃক্ষদেবতার সব জানা আছে। চল ভাই, আমরা তাঁর নিকট গিয়ে ঝগড়া নিষ্পত্তি করি। আমরা কে কত ভাগ পাব তা যাচাই করি।

বৃক্ষকোটরে ধূর্ত বণিকের পিতা এবং আগুনের ফুলকি

সেভাবে তাঁরা দুজন বৃক্ষের নিচে উপস্থিত হলেন। অতিপণ্ডিত প্রার্থনা করলেন, হে ভগবানসদৃশ বৃক্ষদেবতা আমাদের বিবাদ মীমাংসা করে দিন। আমরা সমস্যায় পড়েছি। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো গতি নেই। আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন। তখন অতিপণ্ডিতের পিতা বললেন, তোমাদের বিবাদ কী নিয়ে বল? তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

অতিপণ্ডিত সবিনয়ে বললেন, প্রভু আমরা দুজনে একসঙ্গে ব্যবসা করেছিলাম। দূর-দূরান্তে অনেক কষ্ট করেছি। আমি বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে চাই না। এখন আপনিই মধ্যস্থতা করুন। আমাদের মধ্যে লভ্যাংশের কে কত ভাগ পাবে? বৃক্ষকোটর থেকে উত্তর এলো। পণ্ডিত এক ভাগ, অতিপণ্ডিত দুই ভাগ পাবে। তোমরা ঘরে ফিরে যাও। আমার উপদেশমতো অংশ ভাগ করে নেবে।

বোধিসত্ত্ব এ বিচার শুনে বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করলেন। ভাবলেন এখানে দেবতা আছে কি না জানতে হবে। তিনি খড়কুটা সংগ্রহ করলেন। বৃক্ষের কোটরপূর্ণ করে অগ্নি সংযোগ করলেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ধূর্ত বণিকের পিতার অর্ধাঙ্গ বৃক্ষকোটর থেকে বের হয়ে এলো। সমস্ত শরীর ঝলসে গেছে। শাখা ধরে তিনি নিচে নামলেন। নামবার সময় ধূর্ত বণিকের পিতা বোধিসত্ত্বের প্রশংসা করে বললেন–

সার্থক পণ্ডিত নাম ধর তুমি সাধুবর,
নাহি এতে সন্দেহের লেশ;
অতিপণ্ডিত নিরর্থক হায়, হায়!
তারি দেখে এত মোর ক্লেশ।

অতিপণ্ডিতের পিতা অসহ্য যন্ত্রণা ও মনের দুঃখে নিজ পুত্রকে ভর্ৎসনা করলেন। বোধিসত্ত্বের গুণকীর্তন করে বাড়ি চলে গেলেন। অতিপণ্ডিত নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়ে। পিতাকে অপমান ও কষ্ট দিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে হার মানলেন। অবশেষে দুজনে সমান লভ্যাংশ ভাগ করে নিলেন।

উপদেশ : কাউকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

কুরুঙ্গমৃগ জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কুরুঙ্গমৃগ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বনে বনে ফল খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করতেন। সেই বনে ছিল একটি বড় ছাতিম গাছ। বোধিসত্ত্ব সেই ছাতিম গাছের ফল খেতেন। সে সময় বনের পাশের এক গ্রামে এক ব্যাধ বাস করত। সে হরিণের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সেই ছাতিম গাছের ডালে মাচা বেঁধে শিকারের অপেক্ষায় থাকত। হরিণেরা তা বুঝতে না পেরে ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিত। ব্যাধ সেই হরিণের মাংস বিক্রি করে জীবন ধারণ করত।

গাছের ওপরে বসা শিকারি ব্যাধ এবং ছাতিম গাছের পাশে হরিণ বোধিসত্ত্ব

একদিন সেই ছাতিম গাছের শাখায় মাচার ওপর বসে ব্যাধ বোধিসত্ত্বের জন্য অপেক্ষা করছিল। বোধিসত্ত্ব সেদিন সকালে ছাতিম গাছের দিকে যাওয়ার সময় ভাবলেন, সময়ে সময়ে ব্যাধরা গাছের ওপর মাচা বেঁধে ওঁত পেতে থাকে। কাজেই আমারও উচিত ছাতিম গাছে কোনো ব্যাধ আছে কি না পরীক্ষা করা। এ জন্য বোধিসত্ত্ব সাবধানে দূর থেকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ব্যাধ দেখল, বোধিসত্ত্ব গাছের নিচে আসছেন না। তাই ব্যাধ ছাতিমের শিম ছিঁড়ে বোধিসত্ত্বের দিকে ছুড়ে মারছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বুঝলেন এ গাছে নিশ্চয়ই ব্যাধ আছে। তা না হলে শিমগুলো ছুড়ে মারবে কে?

কাজেই বোধিসত্ত্ব গাছের দিকে বারবার ভালো করে দেখতে লাগলেন। শেষে তিনি পাতার ফাঁক দিয়ে ব্যাধকে দেখতে পেলেন। বোধিসত্ত্ব ব্যাধকে দেখেও না দেখার ভান করে বললেন, হে গাছ, এতদিন তুমি ছাতিমের শিমগুলো ওপর থেকে সোজা নিচের দিকে ফেলতে। আজ তুমি ছুড়ে মারছ কেন? আজ তুমি আমার পরিচিত গাছের মতো ব্যবহার করছ না কেন? কাজেই তুমি যখন তোমার স্বভাব ধর্মমতো কাজ করছ না আমি অন্য কোনো গাছের নিচে চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমার খাবার জোগাড় করি।

এই বলে বোধিসত্ত্ব চলে যাওয়ার উপক্রম এমন সময় ব্যাধ তীর নিক্ষেপ করল। সেই তীর বোধিসত্ত্বের গায়ে লাগল না। তখন ব্যাধ বলল, দূর হও, আজ আমার হাত থেকে রক্ষা পেলে।

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি তোমার হাত থেকে রক্ষা পেলাম বটে। কিন্তু তুমি মহানরক থেকে রেহাই পাবে না। তোমাকে হিংসা, লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি পাঁচ রকম যাতনা ভোগ করতে হবে। এই বলে বোধিসত্ত্ব সেখান থেকে চলে গেলেন। ব্যাধও গাছ থেকে নেমে অন্য জায়গায় চলে গেল।

উপদেশ : বুদ্ধিমান ও সাবধানের মার নেই।

কালকর্ণী জাতক

অতীতকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তখন বোধিসত্ত্ব একজন বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ছিলেন। এই শ্রেষ্ঠীর কালকর্ণী নামে এক মিত্র ছিল। এই কালকর্ণী ছিল তাঁর শৈশবের খেলার সাথি। পরে কালকর্ণী কোনো কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের কাছে সাহায্য চায়।

বোধিসত্ত্ব তখন তাকে তাঁর সম্পত্তি ও বাড়ি দেখাশোনর কাজে নিযুক্ত করেন। সেই থেকে কালকর্ণী তাঁর কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে লাগল।

কালকর্ণী শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে আসার পর থেকে 'কালকর্ণী দাঁড়াও, কালকর্ণী বস, কালকর্ণী যাও' এই সব কথা প্রায় শোনা যেত। তখন শ্রেষ্ঠীর বন্ধু-বান্ধবগণ বিরক্ত হয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল, মহাশ্রেষ্ঠী, আপনার বাড়ি থেকে কালকর্ণীকে সম্বোধন করে দাঁড়াও, বস, খাও, এসব কথা শোনা যায়। এসব ভালো দেখায় না। আপনি তার সঙ্গ ত্যাগ করুন। বোধিসত্ত্ব উত্তরে বললেন, 'দেখ, নাম বস্তু নির্দেশ করে পণ্ডিতেরা কোনো বস্তু বা ২০২০

শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে রাতে ডাকাত দল

ব্যক্তির নাম বিচার করেন না। কোনো নাম শুনেই অমঙ্গল আশঙ্কা করা উচিত নয়। আমি নামের ওপর নির্ভর করে আমার শৈশবের সাথি বাল্যবন্ধুর প্রতি বিমুখ হব না।'

শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের একটি ভোগ গ্রাম ছিল। অর্থাৎ তাঁর ভোগের জন্য রাজা এই গ্রামটি তাঁকে দান করেছিলেন। একদিন তিনি কালকর্ণীর হাতে গৃহরক্ষার ভার দিয়ে সেই গ্রামে চলে গেলেন। তখন চোরেরা ভাবল, এখন শ্রেষ্ঠী বাড়িতে নেই। এই সুযোগে আমরা তাঁর বাড়ি থেকে সর্বস্ব চুরি করব।

এই ভেবে তারা সেদিন রাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ্রেষ্ঠীর বাড়ি ঘিরে ফেলল। এদিকে কালকর্ণী আগেই সন্দেহ করেছিল, আজ রাতে চোরেরা আসতে পারে। তাই সে সেই রাতে না ঘুমিয়ে জেগে বসে ছিল। যখন সে বুঝতে পারল দস্যুরা বাড়ির চারদিকে জড়ো হয়েছে, তখন সে পাড়া-প্রতিবেশীদের জানানোর জন্য 'শাঁখ বাজাও, দামামা বাজাও' বলে চিৎকার করতে লাগল। সে সারা বাড়ি ছোটাছুটি করে তোলপাড় করতে লাগল।

দস্যুরা তা দেখে ভাবল, শ্রেষ্ঠী বাড়িতে নেই একথা সঠিক নয়। বাড়িতে অনেক লোক জেগে আছে। বোধ হয় শ্রেষ্ঠী ফিরে এসেছেন। এক্ষেত্রে বাড়ি লুট করা সম্ভব নয়।

তখন তারা হতাশ হয়ে পাথর, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র ফেলে রেখে চলে গেল। পরদিন সকালে পাড়ার লোকেরা দস্যুদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র দেখে বুঝতে পারল; গত রাতে চোর এসেছিল। তারা ভয় পেয়েছিল। তারা তখন সকলে বলাবলি করতে লাগল, কালকর্ণীর মতো বুদ্ধিমান লোক না থাকলে দস্যুরা শ্রেষ্ঠীর ধনসম্পদ চুরি করে নিয়ে যেত। শ্রেষ্ঠীর ভাগ্য খুব ভালো যে এমন বিশ্বাসী লোক পেয়েছেন।

এমন সময় শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্ব ভোগ গ্রাম হতে ফিরে এসে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। তিনি তখন তাঁর বন্ধু–বান্ধবদের বললেন, তোমাদের কথা শুনে যদি এমন বিশ্বস্ত বন্ধুকে তখন তাড়িয়ে দিতাম তাহলে চোরেরা আমার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যেত।

এরপর তিনি একটি গাথা পাঠ করে তাদের ধর্মোপদেশ দান করলেন। তিনি বললেন, যার সঙ্গে সাত পা চলা হয় তাকে মিত্র বলতে হয়। যার সঙ্গে বারো দিন বাস করা হয় তাকে সখা বলা হয়। যার সঙ্গে এক পক্ষ বা এক মাস বাস করা হয় সে হচ্ছে জ্ঞাতির সমান। যার সঙ্গে বেশি ভাব, যার সঙ্গে একান্তে বাস করা হয় সে হচ্ছে বন্ধু। আত্ম সুখের জন্য আমার শৈশবের বন্ধুকে কি ত্যাগ করতে পারি?

এই বলে সকলকে উপদেশ দিলেন বোধিসত্ত্ব।

উপদেশ : বিপদে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় হয়।

২০২৫

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. জাতকের মূল শিক্ষা কী?

ক. বিনয়সম্মত জীবন গঠন
খ. পরিপূর্ণ জীবন গঠন
গ. অর্থনৈতিক জীবন গঠন
ঘ. মহৎ ও আদর্শ জীবন গঠন

২. ভারতীয় সাহিত্যে কিসের প্রভাব সবচেয়ে বেশি?

ক. সুত্তপিটক
খ. জাতক
গ. ত্রিপিটক
ঘ. ধর্মপদ

৩. ধর্মপাল কুমার কোথায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন করেন?

ক. তক্ষশিলা
খ. বিক্রমশীলা
গ. নালন্দা
ঘ. ময়নামতি

৪. অতিপণ্ডিত বিবাদ মীমাংসার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়?

ক. অতিবুদ্ধি
খ. সুবুদ্ধি
গ. দুষ্টবুদ্ধি
ঘ. উপস্থিত বুদ্ধি

৫. আজীবক মনে মনে কী হলেন?

ক. সন্তুষ্ট
খ. অসন্তুষ্ট
গ. শান্ত
ঘ. রাগান্বিত

৬. ব্যাধ গাছের ডালে কী শিকারের অপেক্ষায় থাকত?

ক. হরিণ
খ. বাঘ
গ. ছাগল
ঘ. পাখি

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. গৌতম বুদ্ধের অতীত .... জাতক বলা হয়।
২. জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা মানুষের জন্য .... মতো।
৩. সার্থক পণ্ডিত নাম ধর তুমি .... ।

৪. শুভ কাজের কোনো .... নেই।
৫. শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের একটি .... গ্রাম ছিল।
৬. বিপদে প্রকৃত .... পরিচয় হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. জাতকের উপদেশ ও	১. অশুভ চিন্তা করে বসে থাকে।
২. এক জন্মের কর্মফলে কেউ	২. ধর্মই তাকে রক্ষা করে।
৩. তুমি শুধু পণ্ডিত বলে এক ভাগ,	৩. ফল খেত।
৪. মূর্খরাই নক্ষত্র লগ্ন শুভ	৪. শিক্ষা সর্বজনীন।
৫. যে ধর্মপথে চলে	৫. আমি অতিপণ্ডিত তাই দুই ভাগ।
৬. বোধিসত্ত্ব সেই ছাতিম গাছের	৬. বুদ্ধ হতে পারে না।
	৭. জাতকের প্রভাব পড়ে।

ঘ. নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. জাতক কাকে বলে?
২. জাতক পাঠের উদ্দেশ্য কী?
৩. ধর্মপাল কুমারের আচার্য কিসের অস্থি নিয়ে গিয়েছিল?
৪. অতিপণ্ডিতের শঠতা কীভাবে ধরা পড়েছিল?
৫. নক্ষত্র জাতকের উপদেশ কী?
৬. শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্ব বন্ধুদের কী ধর্মোপদেশ দিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ কর।
২. মহাধর্মপাল জাতক মতে তরুণ বয়সে মৃত্যু না হওয়ার গুণগুলো লেখ।
৩. নক্ষত্র জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।
৪. ‘কাউকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়’ — এ কথাটি ব্যাখ্যা কর।
৫. কালকর্ণী কীভাবে শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের ধনসম্পদ রক্ষা করেছিল? আলোচনা কর।
৬. উপদেশসহ কুরঙ্গমৃগ জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।

নবম অধ্যায়

ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধ ও বুদ্ধের শিষ্যদের স্মৃতিবিজড়িত তীর্থ, মহাতীর্থ, ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলো অতীব পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ।

তোমরা পূর্বে তীর্থ ও মহাতীর্থ সম্পর্কে জেনেছ। এ অধ্যায়ে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সম্বন্ধে জানতে পারবে।

বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

বৌদ্ধধর্ম একটি সুপ্রাচীন ধর্ম। এ ধর্মের অনেক ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। বিশেষ করে বুদ্ধ, বুদ্ধ শিষ্য, রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠীদের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থানকে বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান বলে। আবার এসকল স্থানে প্রাচীন যেসব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তাকে নিদর্শন বলা হয়। বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও নিদর্শন অত্যন্ত গৌরবময়।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হলো একটি জাতির মূল শেকড়। জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে সংস্কৃতি। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রমুখ চীনা পর্যটকেরা বৌদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কীর্তি ইতিহাসের বিবরণ লিখে গেছেন। বৌদ্ধ বিহারগুলো সেকালে ধর্ম, শাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল।

বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান

ঐতিহাসিক স্থান ইতিহাসের এক পরম সম্পদ। বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান হলো গৌরবময় স্মৃতি ও ঘটনাবিজড়িত পবিত্র স্থান। এগুলো বুদ্ধ, বুদ্ধশিষ্য, অতীতের রাজা-মহারাজা বা ব্যক্তি মানুষের রেখে যাওয়া কীর্তি। এসব কীর্তি কালের আবর্তে ধ্বংস হয়ে গেছে, কিছু কিছু মাটির নিচে নানা কারণে চাপা পড়ে গেছে। পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা এসব স্থান নির্দিষ্ট করেছেন।

পুরাতত্ত্ববিদরা এসব স্থান খনন করে আবিষ্কার করেছেন। খনন কাজের ফলে বৌদ্ধ কীর্তির বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। ঐতিহাসিক বৌদ্ধ স্থানগুলো হলো– শ্রাবস্তী, বৈশালী, রাজগৃহ,

২০২০

নালন্দা, তক্ষশিলা, অজন্তা, কপিলাবস্তু, কুশিনগর, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি।

বাংলাদেশের এরূপ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান আছে। যেমন– বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর, কুমিল্লার ময়নামতি। এ ছাড়াও চট্টগ্রামের পন্ডিত বিহার, চক্রশালা, মহামুনি, রামকোট, ঠেগরপুনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে বৌদ্ধ নিদর্শন হিসেবে আছে সোমপুর মহাবিহার, শালবন মহাবিহার, জগদ্দল মহাবিহার, হলুদ বিহার, সীতাকোট বিহার প্রভৃতি। ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে।

ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব

ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এসব স্থান ভ্রমণ করলে বৌদ্ধ নিদর্শনগুলোর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো দেখা যায়। ঐতিহাসিক স্থানের ভৌগোলিক পরিচয় জানা যায়। এতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যায়। এ ছাড়াও মনের প্রসারতা বাড়ে, ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এসব জায়গা দেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। বই পড়ে লাভ করা জ্ঞানের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখার জ্ঞানের যোগ ঘটে।

বৌদ্ধধর্ম মতে, তীর্থ ভ্রমণ বা ঐতিহাসিক স্থান দর্শন একটি পুণ্যকর্ম। এতে দুঃখ খন্ডন, পুণ্য সঞ্চয়, বর্তমান জন্মে সুখ ও পরকালে সুগতি লাভ হয়। এজন্য সকলেরই সাধ্য অনুযায়ী, সময় ও সুযোগ করে তীর্থ দর্শন করা উচিত। বিশেষ করে ছাত্র–ছাত্রীদের ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণে যাওয়ার গুরুত্ব অত্যধিক।

এককথায় ঐতিহাসিক স্থানে পাওয়া যায় মানুষের শৌর্য, বীর্য ও সমাজ সংস্কৃতির পরিচয়। তাই দেশে ঐতিহ্য সংস্কৃতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তা সংরক্ষণে প্রত্যেকের যত্নবান হওয়া উচিত।

এখন আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা জানতে পারব।

শ্রাবস্তী

শ্রাবস্তী ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডা জেলার অচিরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। এ নগরকে অনেকে 'সবস্থ' বা 'সাবস্ত' বলে। আবার কেউ কেউ 'সবস্থ' ঋষির নামানুসারে এই স্থানের নাম শ্রাবস্তী হয়েছে বলে মনে করেন।

শ্রাবস্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ, গোন্ডা, ভারত

শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত–মাহেত।

বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী ছিল উত্তর প্রদেশের শ্রেষ্ঠ জনপদ। এটি ছিল কোশলরাজ প্রসেনজিৎ –এর রাজধানী ও শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র। শ্রাবস্তীর সঙ্গে বুদ্ধের জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই শ্রাবস্তী বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

শ্রাবস্তীতে জেতবন, পূর্বারাম এবং রাজকারাম নামে তিনটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। এর মধ্যে জেতবন বিহারটি খুবই সুন্দর। শ্রাবস্তীর ধনী শ্রেষ্ঠী ছিলেন সুদত্ত। তিনি বহু স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রাজকুমার জেতের কাছ থেকে জেতবন উদ্যান ক্রয় করেন। সেখানে তিনি

জেতবন বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দান করেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠী সুদত্ত অনাথপিণ্ডিক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধের খুব প্রিয় গৃহী শিষ্য ছিলেন। তিনি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণের স্থান হিসেবে জেতবন উদ্যান পছন্দ করেন। এটি ছিল রাজকুমার জেতের প্রমোদ উদ্যান। সুদত্ত শ্রেষ্ঠী এটি কিনতে চাইলে রাজকুমার বললেন, সোনার মোহরে জমিটি ঢেকে দিতে পারলে তিনি তা বিক্রি করবেন। সুদত্ত শ্রেষ্ঠী সোনার মোহর এনে জায়গাটি ভরে দিলেন। জায়গাটি ক্রয় করেন। তারপর তিনি সেখানে নির্মাণ করেন বিরাট জেতবন বিহার।

ইতিহাস মতে, এতে ৬০টি বড় হলঘর ও ৬০টি ছোট-বড় কক্ষ ছিল। বিহারটির তোরণ নির্মাণ করেন রাজকুমার জেত। এই বিহারের ভিতরে ছিল কয়েকটি কুটির। বুদ্ধ জেতবনে ১৯টি বর্ষা যাপন করেন। এখানে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এর পূতাস্থি রাখা হয়। সম্রাট অশোক তা পরে অন্য স্থানে পুনপ্রতিষ্ঠা করেন।

মহাউপাসিকা বিশাখা পূর্বারাম নামে এক মহাবিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন। বিশাখা ছিলেন সাহেত নামক স্থানের এক ধনী শ্রেষ্ঠীর সুন্দরী কন্যা। পরে শ্রাবস্তী নগরীর শ্রেষ্ঠী মিগার বিশাখাকে নিজের পুত্রবধূ করে ঘরে আনেন। বিশাখা বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। বিশাখাকে মিগার মাতা বলা হয়। তাই পূর্বারাম বিহারটি মিগারমাতা বিহার নামে পরিচিত। বিহারটি ছিল দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট। বুদ্ধ পূর্বারামে ছয় বর্ষা যাপন করেন। জানা যায়, বিশাখা মহামূল্যবান সোনার হার বিক্রি করে এই পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করেন।

জেতবনের তৃতীয় বিহার রাজকারাম। কোশালরাজ প্রসেনজিৎ এই বিহার নির্মাণ করেন। অগ্রমহিষী মল্লিকা দেবীর অনুরোধে রাজা প্রসেনজিৎ এখানে একটি অতিথিশালাও নির্মাণ করেন। এর নাম ছিল মল্লিকারাম। এতে বুদ্ধের ধর্মদেশনা ও ধর্মালোচনা হতো।

শ্রাবস্তীর কাছেই ছিল অঞ্জন বন। বুদ্ধের শিষ্য গবম্পতি এখানে বাস করতেন। থেরী সুজাতা বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে এখানে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিকা উৎপলবর্ণাও বাস করতেন শ্রাবস্তীতে। বর্তমানে মাহেত ও সাহেত নামক স্থানে প্রাচীন শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে মাহেতের জেতবন বিহারের ধ্বংসাবশেষের প্রায় চারশত একর এলাকা জুড়ে রয়েছে মূল শ্রাবস্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

২০২৫

বৈশালী

বৈশালী ভারতের বিহার রাজ্যের মোজাফ্ফরপুর জেলায় অবস্থিত। বৈশালী বর্তমানে বেসার নামে পরিচিত। রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া থেকে সড়কপথে এখানে যাওয়া যায়। বুদ্ধের সময় বৈশালী সমৃদ্ধ নগরী ছিল। এটি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন গণরাজ্য। এটি লিচ্ছবিদের গণরাজ্যের রাজধানী ছিল। আটটি জাতির মিলিত শক্তিতে এই গণরাজ্য গঠিত ছিল।

বৈশালী নগরীর চৈত্য স্তূপ, মোজাফ্ফরপুর, ভারত

গণশক্তির মধ্যে লিচ্ছবিরা ছিল সংখ্যায় বেশি। সেজন্য একে লিচ্ছবি গণরাজ্য বলা হয়। ত্রিপিটকের মহাবর্গে এর উল্লেখ আছে। এখানে বহু প্রাসাদ, কূটাগার, প্রমোদ উদ্যান ও পুকুর ছিল। বুদ্ধ বৈশালীতে অনেকবার আসেন। তিনি এখানে বর্ষাবাস যাপন করেন। এখানে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যসহ নর্তকী আম্রপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁকে ত্রিশরণে দীক্ষিত করেন। আম্রপালি বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। চাপাল চৈত্যে অবস্থান করা কালে বুদ্ধ তাঁর পরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর লিচ্ছবিরা তাঁর পূতাস্থি এনে এখানে স্তূপ নির্মাণ করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, 'রাজাবিশালকাগড়' নামক স্থানটি প্রাচীন বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ। এটি খননের ফলে এখানে অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ বৈশালী পরিদর্শন করেন। এখানে তাঁরা অনেক স্থাপত্য ও প্রাচীন শিল্পের নমুনা দেখতে পান। রাজাবিশালকাগড়ের উত্তরে কোলৌ নামক স্থানের অনতিদূরে আছে সিংহমূর্তিসহ একটি স্তম্ভ। এর মধ্যে আছে অশোকের শিলালিপি। হিউয়েন সাঙ এটি দেখতে পান।

বৈশালী জৈনদের বড় তীর্থস্থান। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

তক্ষশিলা

তক্ষশিলা ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালেই এ বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ যুগের পূর্ববর্তীকালেও তক্ষশিলা বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তক্ষশিলা পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি নগরের চব্বিশ কিলোমিটার দূরে সরাইকলা নামক রেলওয়ে জংশনের পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত। এটি গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখনো বিশাল এলাকা জুড়ে প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ পরিলক্ষিত হয়। গ্রিক পণ্ডিত তাঁদের গ্রন্থে তক্ষশিলার সমৃদ্ধি ও গৌরবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় আর্যগণ অতি প্রাচীনকালেই এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ, সরাইকলা, রাওয়ালপিন্ডি

২০২৫

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী চাণক্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত ছিলেন। অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ সূত্রের রচয়িতা পাণিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র। বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মরক্ষা ও মাতঙ্গ তক্ষশিলার প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য চীন দেশে গিয়েছিলেন। গুপ্ত রাজাদের শাসনামলে চীন দেশ থেকে দলে দলে শিক্ষার্থী ছাত্ররা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে।

এখানে নানা ললিতকলা, ধর্মদর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো। মহাবর্গ গ্রন্থেও এর বিপুল খ্যাতির কথা বর্ণিত আছে।

তক্ষশিলাকে বৌদ্ধগণ 'তক্কসির' বা 'তাকসিলা' নামে অভিহিত করেছেন। জাতক অনুসারে জানা যায় বুদ্ধ কোনো এক জন্মে এ স্থানে শির দান করে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কুম্ভকার জাতকে উল্লেখ আছে যে, তক্ষশিলা 'নগ্‌গজি' নামক এক রাজার রাজধানীও ছিল।

সম্রাট বিন্দুসার কুমার অশোককে তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। দীপবংস থেকে জানা যায়, দীপংকর নামে এক বৌদ্ধ রাজা ও তাঁর ১২ জন উত্তরসূরি তক্ষশিলা শাসন করেন। কুষাণরাজ কণিষ্কের সময়ে তক্ষশিলা থেকে রাজধানী পুরুষপুরে স্থানান্তরিত করলে তক্ষশিলার মর্যাদা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়। তৎকালে রাজপুত্র, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলাকেই প্রাধান্য দিতেন। রাজবৈদ্য জীবক তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বছর আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন।

কথিত আছে, তিনি চৌদ্দ বছরের শিক্ষণীয় বিষয় সাত বছরে সমাপ্ত করেছিলেন। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তাঁকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রদান করেছিল। হুন জাতি ৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে এ নগর আক্রমণ করে ধ্বংস করেন।

মহাস্থানগড়

বাংলাদেশের বগুড়া শহর থেকে উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। এর প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। একসময় পুণ্ড্রবর্ধন উত্তরবঙ্গের শাসনকেন্দ্র ছিল। মহাস্থানগড়ের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মৌর্য, গুপ্ত ও পাল রাজাদের রাজত্বকালে এটি বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল।

২০২০

এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক বৌদ্ধ বিহার, চৈত্য ও বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ স্থানে খনন কার্যের ফলে বিভিন্ন যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধযুগের বহু নিদর্শন এ স্থানে বিদ্যমান।

মহাস্থানগড়, বগুড়া

ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধনই মহাস্থানগড়। এটি প্রাচীন বাংলার সর্ববৃহৎ নগরী ছিল।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এখানে আসেন। তিনি এখানে অনেকগুলো বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য দেখেছিলেন। নগর প্রান্তে বুদ্ধের দেহাবশেষ সংরক্ষিত একটি স্তূপ দেখতে পান। সম্রাট অশোক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

১৮০৮ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ বুকানন হেমিল্টন স্থানটির প্রথম বর্ণনা দেন। ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম স্থানটি পরিদর্শন করেন। ১৯৭৩–৭৪ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নরপতির ধাপ নামক জঙ্গল খনন করতে গিয়ে ভাসু বিহার আবিষ্কার করে। এটি একটি বিরাট বিহার।

ভাসু বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাচীন মুদ্রা, নানা দ্রব্য, ধ্যানী বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী, ধর্মচক্র ও বুদ্ধ পুজারিণীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া বহির্ভাগে গোবিন্দ ভিটা, খংকনির কুন্ড, বৈরাগী ভিটা প্রভৃতি নিদর্শন আছে।

২০২০

মহাস্থানের খনন কাজ অনেক দিন আগে শুরু হয়েছিল। এখনও শেষ হয়নি। অর্ধখনন অবস্থায় পড়ে আছে। প্রাচীন নিদর্শন সমৃদ্ধ মহাস্থানগড় অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ এলাকার মাটির নিচে পড়ে আছে বহু বৌদ্ধ নিদর্শন। সঠিকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ চালানো হলে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে।

পাহাড়পুর

পাহাড়পুর জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি নওগাঁ জেলার একটি বৌদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পালবংশীয় রাজাগণ বাংলাদেশ শাসন করেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। রাজা ধর্মপাল তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নাম ছিল সোমপুর মহাবিহার। এ বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সোমপুর (বা ওমপুর) গ্রামটি এখনও সেই প্রাচীন নামের স্মৃতি বহন করছে।

সে সময় এত বড় বিহার হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলে আর ছিল না। ভারতের উত্তরে নর্মদা থেকে উজ্জয়িনী পর্যন্ত রাজা ধর্মপালের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজ্যের মধ্যেও এটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বিহার। তাঁর স্ত্রী রন্নাদেবী ‘মূর্তিমতি কীর্তি’ বলে বর্ণিত হয়েছেন। কারণ তিনিও অনেক বিহার ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সে বিহার ও মন্দির সোমপুর বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। রাজা ধর্মপালের উদারতা ও বৌদ্ধধর্মে পৃষ্ঠপোষকতাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্মপাল সোমপুর বিহারকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেখে আরও পঞ্চাশটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইটের তৈরি উঁচু ও পুরু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল প্রতিষ্ঠানটি। সোমপুর বিহারের অভ্যন্তরে ১৭৭টি কক্ষ ছিল। সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতেন এবং ধর্মচর্চা ও ধ্যান সমাধি করতেন।

সোমপুর মহাবিহার, নওগাঁ

বিশাল বিহার সংলগ্ন ছিল জলাধার ও জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা। সোমপুর বিহারের ভিত্তি ও নিচের চত্বরের কারুকাজ ছিল অপূর্ব। পোড়ামাটির তৈরি ফলকের বিভিন্ন চিত্র সহজেই মনকে আকর্ষণ করে।

মহাপণ্ডিত ভিক্ষু বোধিভদ্র ও অতীশ দীপঙ্কর এ বিহারে অবস্থান করতেন। তাঁদের রচিত বহু গ্রন্থ তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এ বিহারে বসে ভাব বিবেকের'মধ্যমকর রত্নদীপ' গ্রন্থ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি তিব্বতে ধর্ম প্রচার করে অমর হয়ে আছেন। কল্যাণশ্রী মিত্র ও বিপুলশ্রী মিত্র এ বিহারে থাকতেন। পাল বংশের পতনের পর ধীরে ধীরে বিহারের উন্নয়ন সমৃদ্ধি লুপ্ত হতে থাকে। একসময় অযত্ন অবহেলায় প্রাকৃতিক কারণে এটি মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। সম্প্রতি জাতিসংঘ সোমপুর বিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

রামকোট

কক্সবাজারের নিকটবর্তী রম্যভূমি রামুর রামকোট বিহার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য। একসময় রামু বৌদ্ধ সংস্কৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রামুর লামার পাড়া কেয়াং, সীমা বিহার অত্যন্ত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।

রামুর রামকোট বিহার, কক্সবাজার

রামকোট ছোট বড় অনেকগুলো পাহাড় বেষ্টিত। পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ইটের স্তূপ, বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ, শিলালিপি, পোড়ামাটির ফলক এখনো অনুচ্চ টিলার ওপর অবস্থিত। পাশে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে রামকোট জগৎজ্যোতি শিশু সদন।

১৯৩০ সালে জগৎচন্দ্র মহাস্থবির শ্রীলংকায় উদ্ধারকৃত একটি শিলালিপিতে রামকোট বিহারের কথা জানেন। এতে প্রাপ্ত তথ্যমতে অনুসন্ধান ও খননকার্য চালিয়ে এ সুবৃহৎ সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করেন। এতে বেলে পাথরের নির্মিত ভাস্কর্যের মধ্যে বুদ্ধের দুটি পদচিহ্ন (পূর্ণাকার) ও হস্তপদাদি ভগ্ন ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রাণপুরুষ ছিলেন চকরিয়া হারবাং –এর চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির। তিনি ছিলেন চেন্দি রাজের পুত্র। তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার অভিযানে রামুর পল্লিগ্রামে এসে উপনীত হন। রামুতে তিনি সাতটি ধর্মচৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাস মতে, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে ধর্মপালের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম স্বল্প সময়ের জন্য পাল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। রাজা ধর্মপাল শাসিত বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের রাজধানী ছিল রাহমী বা রাহমা। অর্থাৎ বৃহত্তম চট্টগ্রামের রামু। রামুকে রম্যভূমি বা রম্যস্থান বলা হয়। রামুর প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস হিন্দু–মুসলিম শাসনামলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মতে, রামকোট বৌদ্ধ বিহার ও সধাতুক বড় বুদ্ধমূর্তি সম্রাট অশোকের নির্মিত ৮৪ হাজার চৈত্যের মধ্যে একটি। ঐতিহাসিক রামকোটে প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা বসে। এই প্রত্নস্থল ও প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি দর্শনে স্বদেশি বিদেশি অনেক পর্যটক ও ইতিহাস গবেষক আসেন। এটি বর্তমানে প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও পুণ্যতীর্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

তোমরা বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শন করবে। বাংলাদেশের সর্বত্র মাটির নিচে বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, উয়ারি বটেশ্বর, চক্রশালা, রামকোট প্রভৃতি স্থানগুলো পুরাতন স্মৃতি হিসেবে বৌদ্ধদের কাছে তীর্থে পরিণত হয়েছে। পর্যটকদের কাছেও অজানাকে জানার প্রেরণা দিচ্ছে। ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর। আমাদের হারানো গৌরবময় অতীতকে জানতে হলে এসব ঐতিহাসিক স্থান দর্শন প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার এ লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. কারা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশ সাধন করেছিলেন?

ক. পালরাজারা খ. ক্ষত্রিয়রাজারা
গ. সেনরাজারা ঘ. বজ্জিরাজারা

২. বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করার উদ্দেশ্য কী?

ক. নিজের ইচ্ছা পূরণ খ. মনের প্রসারতা বৃদ্ধি
গ. বুদ্ধ জ্ঞান লাভ ঘ. মার্গফল লাভ

৩. মহাউপাসিকা বিশাখা কোন বিহার নির্মাণ করেন?

ক. পূর্বারাম খ. জেতবন
গ. সোমপুর ঘ. বুদ্ধগয়া

৪. সম্রাট বিন্দুসার কাকে তক্ষশিলা বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন?

ক. ধর্মপাল খ. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান
গ. অজাতশত্রু ঘ. কুমার অশোক

৫. বুদ্ধ কোথায় পরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করেন?

ক. শ্রাবস্তী খ. তক্ষশিলা
গ. চাপাল চৈত্য ঘ. কুশীনগর

৬. মহাস্থানগড় কোন জেলায় অবস্থিত?

ক. বগুড়া খ. রাজশাহী
গ. রংপুর ঘ. দিনাজপুর

৭. পাহাড়পুরে অবস্থিত বিহারটির নাম কী?

ক. বেণুবন খ. শালবন
গ. সোমপুর ঘ. ভাসু বিহার

৮. রামকোট কে আবিষ্কার করেন?

ক. জগৎচন্দ্র মহাস্থবির খ. সারমেধ মহাথের
গ. চন্দ্রজ্যোতি মহাথের ঘ. সত্যপ্রিয় মহাথের

২০২০

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে ....।
২. ঐতিহাসিক স্থান ইতিহাসের এক পরম .... ।
৩. ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি .... সৃষ্টি হয়।
৪. শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম ....।
৫. জীবক ....বছর আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন।
৬. সম্রাট অশোক .... নির্মাণ করেছিলেন।
৭. রামকোটে প্রতিবছর .... মেলা বসে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হলো	১. বৌদ্ধ ছিলেন।
২. বুদ্ধের সময়ে বৈশালী	২. উত্তরবঙ্গের শাসনকেন্দ্র ছিল।
৩. বৌদ্ধ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠী সুদত্ত	৩. একটি জাতির মূল শেকড়।
৪. একসময় পুণ্ড্রবর্ধন	৪. ১৭৭টি কক্ষ ছিল।
৫. পাল বংশের রাজারা	৫. সমৃদ্ধ নগরী ছিল।
৬. সোমপুর মহাবিহারে	৬. অনাথপিণ্ডিক নামে পরিচিত ছিলেন।
	৭. গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল।

ঘ. নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. পাঁচটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের নাম লেখ।
২. তক্ষশিলায় কারা বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেছিলেন উল্লেখ কর।
৩. শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪. মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম কী? স্থানটি কেমন ছিল?
৫. সোমপুর বিহারে কোন কোন পণ্ডিত অবস্থান করেছিলেন?
৬. ভাসু বিহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৭. রামুর প্রাচীন নাম কী ছিল?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধ ঐতিহ্য কী? ঐতিহাসিক স্থানগুলো কেন দর্শন করবে?
২. ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।
৩. তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ দাও।
৪. বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বৈশালীর বর্ণনা দাও।
৫. সোমপুর মহাবিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৬. মহাস্থানগড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৭. ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে রামকোট বিহারের বর্ণনা দাও।

দশম অধ্যায়

ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান

বৌদ্ধরা বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন হয়। পুণ্য দ্বারা সংসার জীবনে সুখ আসে। এজন্য বৌদ্ধরা শ্রদ্ধার সাথে বিভিন্ন পুণ্য তিথি পালন করে।

ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে তোমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। এখন তোমরা ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবে। উৎসবের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে প্রচলিত। যেমন– সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান, প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা, প্রবারণা এবং কঠিন চীবর দান প্রভৃতি। পরিত্রাণ ও নবরত্ন সূত্র পাঠ, বহুচক্র মেলাও ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের অন্তর্গত। এ ছাড়া পরিবাস বা ওয়াইক, জন্ম–জয়ন্তী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, আরও অনেক রকম ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান পালিত হয়।

বৌদ্ধরা বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী। এজন্য বৌদ্ধরা সুখ লাভের আশায় বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান করে থাকে। এসব শুভ কর্মের দ্বারা মন হতে পাপ দূরীভূত হয়। মনে পুণ্য সঞ্চিত হয়। পুণ্য প্রভাবে মানুষ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়।

প্রতিটি বিহারে পূর্ণিমার দিন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। পূর্ণিমা ছাড়াও অন্যান্য পার্বণ দিনেও বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। পারিবারিকভাবে সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান, প্রব্রজ্যাসহ আরও নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে বিহারে কিংবা গৃহে অনেক লোকের সমাগম হয় । এসব উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করলে একজনের সাথে অন্যজনের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতে কুশল বিনিময় হয়। ভাব বিনিময় হয়। এতে জ্ঞাতি মিলন হয়। স্বজন পরিজনসহ নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যভাব সৃষ্টি হয়। নিজেদের মধ্যে মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। সৌহার্দ্যভাব সৃষ্টি হলে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা দূরীভূত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। নিজেদের মনের মলিনতা দূর হয়। মন উদার হয়। সামাজিক ঐক্য–সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে প্রত্যেককে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা–পার্বণ ও আচার–অনুষ্ঠানে যোগদান করা কর্তব্য।

সংঘদান

বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সংঘদান অন্যতম। বৌদ্ধরা যেকোনো শুভ ও মঙ্গল কর্মে সংঘদান করে থাকে। ভগবান বুদ্ধ সংঘকে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র বলেছেন। কারণ তাঁরা শীলবান ও ঋজু প্রতিপন্ন। তাই সংঘকে দান করলে মহাফল লাভ হয়। কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও সংঘদান করা হয়। এ ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠান, নব জাতকের অন্নপ্রাশনের সময়, প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানে সংঘদান করা হয়। এ দান বছরের যেকোনো সময় করা যায়। সংঘদান উপলক্ষে কমপক্ষে ৪ জন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ বা ফাং করতে হয়।

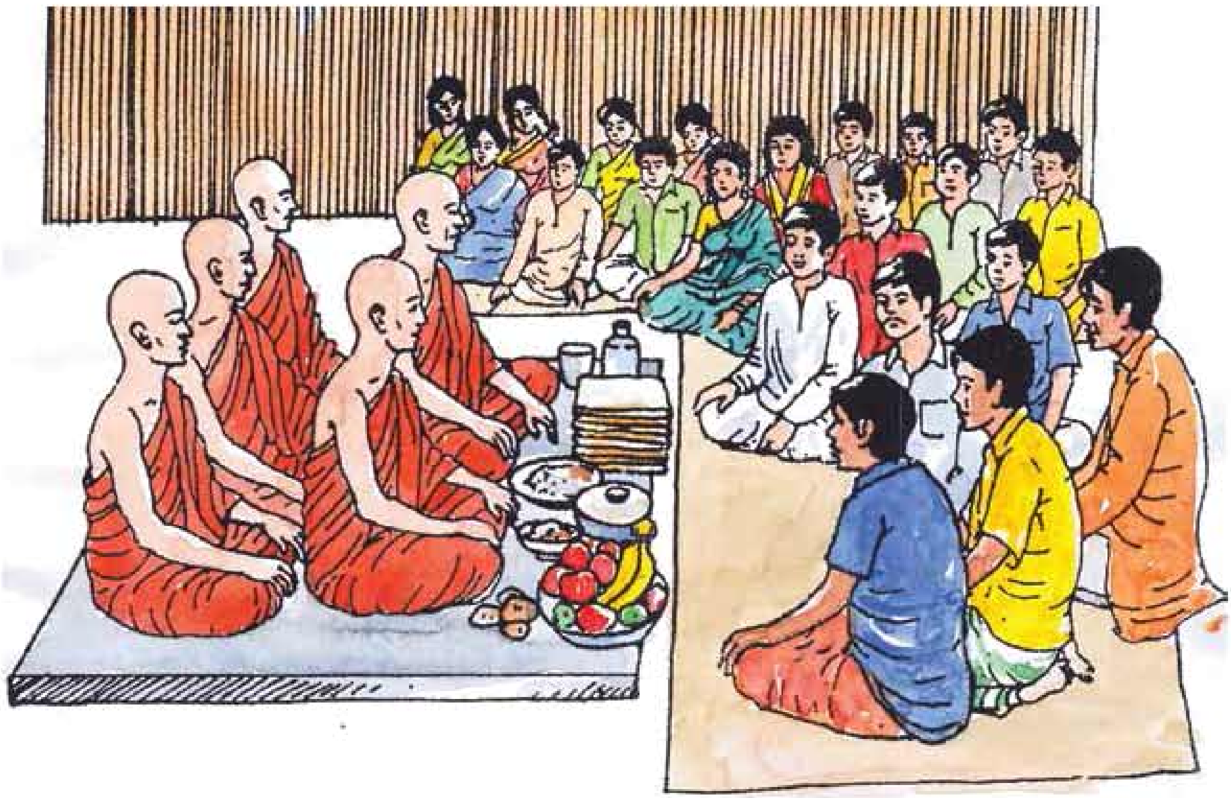

সংঘদানে অংশগ্রহণকারী দায়ক-দায়িকা ও ভিক্ষুসংঘ

সংঘদানে নিমন্ত্রিত ভিক্ষুসংঘের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই পঞ্চশীল প্রদান করেন। সংঘদান উৎসবের মন্ত্র হলো "ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খু সংঘস্স দেমা পূজেমা"— মন্ত্র বলে সংঘদান উৎসর্গ করেন। সংঘদান অনুষ্ঠানে জ্ঞানী পণ্ডিত ভিক্ষুরা সংঘদানের তাৎপর্য নিয়ে ধর্মদেশনা করেন। সংঘদানের পুণ্য ফল ব্যাখ্যা করেন।

২০২০

যেকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। সংঘদানের জন্যও দাতারা ভিক্ষুদের ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন দানের উপকরণ দিয়ে থাকে। অনেকে সংঘদানের সময় ভিক্ষুদের নিত্য প্রয়োজনীয় অষ্টপরিষ্কারও দান করে থাকেন।

প্রবারণা

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে পূর্ণিমা তিথিগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। বিভিন্ন পূর্ণিমা উৎসবের মধ্যে আশ্বিনী পূর্ণিমার তাৎপর্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আশ্বিনী পূর্ণিমার অপর নাম প্রবারণা পূর্ণিমা। এ দিবসে ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসের পরিসমাপ্তি হয়। তাই এ পুণ্য তিথিতে ভিক্ষুরা বিনয় কর্মের মাধ্যমে প্রবারণা করে থাকেন।

'প্রবারণা' শব্দের অর্থ হলো পাপকে বারণ করা। অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি হতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এ তিন মাস বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করা হয়। এ তিন মাসের মধ্যে একজন ভিক্ষু যেকোনো অপরাধ করতে পারেন। তাই প্রবারণা পূর্ণিমায় করজোড়ে বসে অপরাধ মার্জনাপূর্বক বিনয়কর্ম সম্পাদন করেন। সে মন্ত্রটি হলো : আমি দেখেছি, শুনেছি এবং সন্দেহ করছি, এমন কোনো আপত্তিজনক কাজ করলে আমাকে ক্ষমা করে দিন।

গৃহী বৌদ্ধদেরও প্রবারণার তাৎপর্য উপলব্ধি করা উচিত। নিজ মন শুদ্ধির জন্য প্রবারণার তাৎপর্য অনুধাবন করা কর্তব্য।

প্রবারণার দিন বিহারে ও গৃহে অনেক আনন্দ উৎসব চলে। ঘরে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়। বিহারকে নানা রঙে সাজানো হয়। এমনকি গ্রামের রাস্তাগুলোকেও নানা রঙিন কাগজ ও ধর্মীয় পতাকায় সাজানো হয়। সেদিন সকাল থেকে গ্রাম ও বিহার যেন উৎসবমুখর হয়। ছোট-বড় সবাই সেদিন বিহারে যায়। বিহারে সকালে সংঘদান হয়। বুদ্ধ পূজা করা হয়। গৃহীরা পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। উপাসক–উপাসিকারা অষ্টশীল নেন। বিকেলে প্রবারণার তাৎপর্যের ওপর আলোচনা সভা হয়। এতে ভিক্ষুসংঘসহ অনেক পণ্ডিত দায়ক–দায়িকা প্রবারণার নানা দিক তুলে ধরেন।

সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো হয়। দেশ ও বিশ্বের শান্তি কামনায় সমবেত প্রার্থনা করা হয়। এরপর ফানুস উড্ডয়ন করা হয়। এতে ছোট-বড়, নবীন-প্রবীণ সকলে আনন্দে মেতে ওঠে। রাতে ধর্মীয় কীর্তন বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২০২১

কঠিন চীবর দান

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে কঠিন চীবর দান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানে এ কঠিন চীবর দানোৎসব জাতীয় অনুষ্ঠান হিসেবে রূপ লাভ করেছে। এ দান উপলক্ষে বৌদ্ধরা জাতীয় ও ধর্মীয় সম্মেলনও করে থাকে। অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান বছরের যেকোনো সময়ে করা যায়। কিন্তু কঠিন চীবর বছরে একটি বিহারে একবার মাত্র করা যায়। এ দানোৎসব করতে হলে অনেক ধর্মীয় বিধান মানতে হয়।

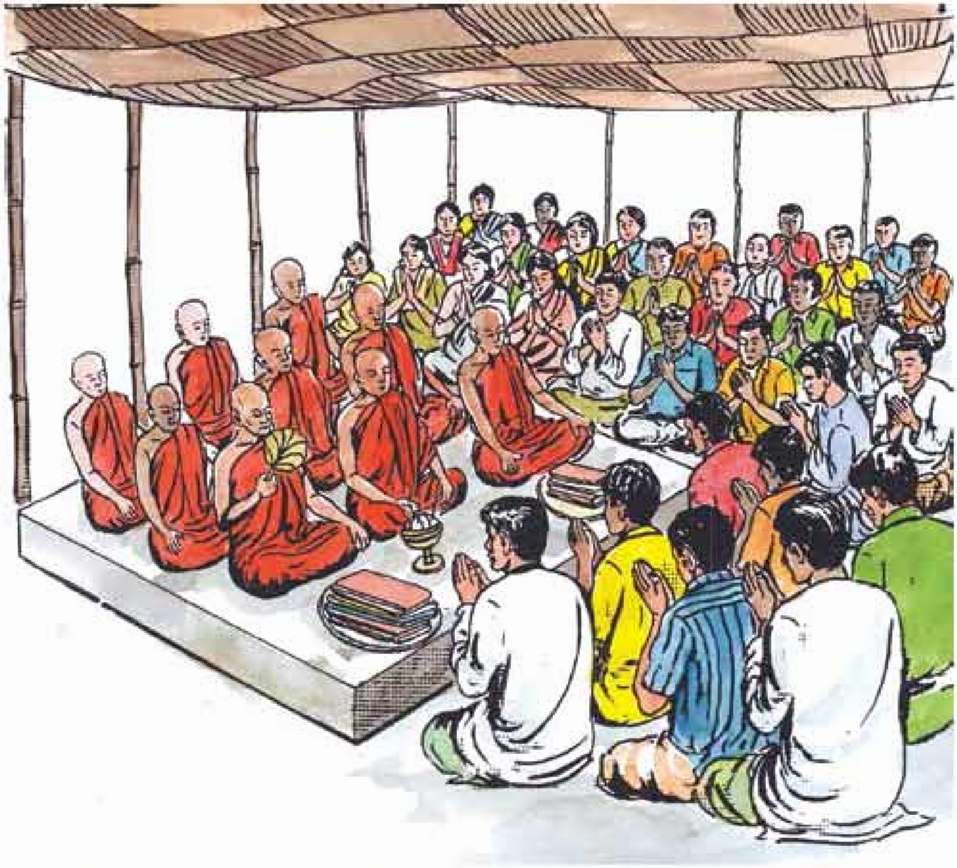

বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসবে অংশগ্রহণকারী, ভিক্ষুসংঘ এবং সকল স্তরের নর-নারী ও বালক-বালিকাবৃন্দ

ভিক্ষুদের আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন বর্ষাবাস গ্রহণ করতে হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে আশ্বিনী পূর্ণিমার পূর্বদিন পর্যন্ত বর্ষাব্রত গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়। এ তিন মাসকে বর্ষাবাস বা ওয়া মাস বলা হয়। বর্ষাবাস করার জন্য ভিক্ষুদের বিভিন্ন নিয়ম আছে।

ভিক্ষুদের ব্যবহার্য যেকোনো একটি চীবর দিয়ে কঠিন চীবর দান করা যায়। কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে বিহারের বর্ষাবাস গ্রহণকারী ভিক্ষু ব্যতীত কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুকে ফাং বা

নিমন্ত্রণ করতে হয়। বিহারের দায়ক–দায়িকারা চীবর ও দানের সামগ্রীসহ ভিক্ষুসংঘের সামনে উপস্থিত হন। দায়ক–দায়িকাগণ বয়োজ্যেষ্ঠ মহাথেরোর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। এরপর "ইমং কঠিন চীবরং ভিক্‌খুসংঘস্‌স দেমা পূজেমা কঠিনাত্তরিতুং" বলে তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করেন। দাতাগণ মুখে মুখে সে মন্ত্র উচ্চারণ করে চীবরটি ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ভিক্ষুগণ এ দানকৃত চীবর সীমায় নিয়ে কর্মবাচ্চা পাঠ করে বর্ষাবাস সমাপনকারী ভিক্ষুকে প্রদান করেন।

এ কঠিন চীবর দানোৎসব উপলক্ষে বিহারকে পরিষ্কার করা হয়। বর্ণাঢ্যভাবে সাজানো হয়। সকালে সংঘদান করা হয়। ধর্মাসভায় পণ্ডিত ভিক্ষুগণ কঠিন চীবর দানের তাৎপর্য দেশনা করেন। ভগবান বুদ্ধও কঠিন চীবর দানের মহাফল সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, ভিক্ষুগণ তাও দেশনা করেন। সভায় বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন সম্পর্কেও আলোচনা হয়। এতে দেশের বরেণ্য পণ্ডিত ভিক্ষু ও গৃহীরা অংশগ্রহণ করেন।

এ দানোৎসবে নানা সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। রাতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক যাত্রা, নাটক, কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। শিশু–কিশোর, যুব–বৃদ্ধ সকলে আনন্দে মেতে থাকে। সারাদিন আনন্দ উৎসবে বিভোর থাকে।

লোক সমাজে বাস করতে হলে নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ভাব গড়ে তুলতে হয়। নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। এজন্য পরস্পরের সাথে মৈত্রী বন্ধন রচনা করতে হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানই মিলনের জন্য একমাত্র সেতুবন্ধ। এর দ্বারা নিজের ও সমাজের বহু মঙ্গল সাধিত হয়।

প্রব্রজ্যা

বুদ্ধের অনুশাসন মতে গৃহীদের জীবনে একবার হলেও প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণ করতে হয়। যারা প্রব্রজিত হন, তাঁদের কমপক্ষে ৭ বছর বয়সের হতে হয়। রাহুলও ৭ বছর বয়সে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নেন।

শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে হলে মাতা–পিতার অনুমতি প্রয়োজন হয়। এখন তোমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিয়মগুলো জানবে।

শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে প্রথমে মস্তক মুণ্ডন করতে হয়। ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র, সূচ-সুতা, কটিবন্ধনী, জল ছাঁকনি, ক্ষুর প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে বিহারে ভিক্ষুর নিকট গমন করতে হয়। শ্রামণের ব্যবহারের জন্য পাটি, বালিশ, মশারি, চাদর, স্যান্ডেল, তোয়ালে প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী ও পূজার নানা উপকরণ দান করা যায়।

সে সময় বাদ্য বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে এবং সাধুবাদ ধ্বনি দিয়ে দায়ক-দায়িকারা বিহারে যান। যিনি শ্রমণ হবেন, তাঁকে প্রথমে বুদ্ধমূর্তির সামনে ধূপবাতি জ্বালিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। পরে বড় জনদের নমস্কার করে, গুরু ভন্তের সামনে চীবর ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বসতে হয়। পরে গুরুর মুখে মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। শ্রমণ হওয়ার পর উপস্থিত উপাসক-উপাসিকাগণ নব দীক্ষিত শ্রমণকে বন্দনা করে থাকেন। নব দীক্ষিত শ্রমণকে তখন হতে দশশীল পালন করতে হয়। এর সাথে ৭৫ প্রকার সেখিয়া ধর্মও পালন করতে হয়।

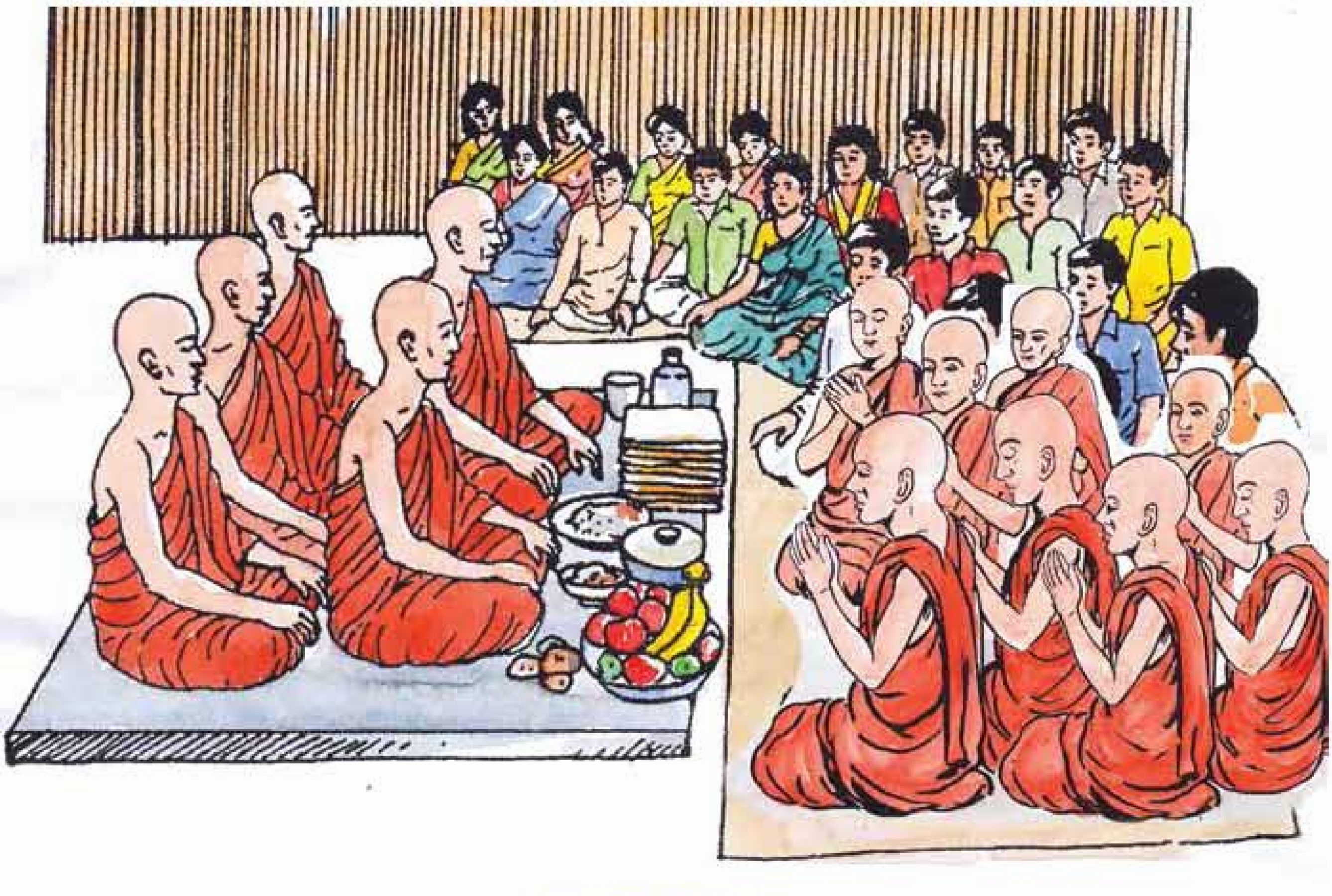

ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ

২০২০

পালি 'পব্বজ্জা' হতে বাংলায় প্রব্রজ্যা এসেছে। 'প্রব্রজ্যা' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো পাপকর্ম বর্জন করা। যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হন, তাঁরা কায়মনোবাক্যে কোনো রকম পাপ করতে পারে না।

তোমরা প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করে কীভাবে শ্রমণ হয় আগে জেনেছ। এখন জানবে উপসম্পদা কী? শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর পরিপূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে উপসম্পদা লাভ করা যায়। প্রব্রজিত জীবনের উচ্চতম পদ হলো উপসম্পদা। উপসম্পদা হলো ভিক্ষুত্বে উপনীত হওয়া। উপসম্পদা প্রাপ্ত শ্রমণ 'ভিক্ষু' নামে পরিচিতি লাভ করেন। ২০ বছরের কম বয়সে উপসম্পদা লাভ করা যায় না। ভিক্ষু হওয়ার জন্য সীমাঘর প্রয়োজন হয়। ভিক্ষুগণ ২২৭ শীল গ্রহণ ও পালন করেন।

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে পার্থক্য কী তোমরা জানতে পারবে।

প্রব্রজ্যা বা শ্রমণ	উপসম্পদা বা ভিক্ষু
১. সাত বছর পূর্ণ না হলে কেউ শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না। ২. সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান ও শ্রদ্ধা থাকলেই শ্রমণ হওয়া যায়। ৩. যেকোনো একজন বয়স্ক স্থবির (ভন্তে) শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা দিতে পারেন। ৪. যেকোনো স্থানে শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করা যায়। ৫. শ্রমণদের দশশীলসহ ৭৫ প্রকার সেখিয়া ধর্ম পালন করতে হয়। ৬. শ্রমণদের প্রতিদিন দশশীল গ্রহণ করা কর্তব্য। ৭. শ্রমণেরা নিজ হাতে যেকোনো খাবার গ্রহণ করতে পারে।	১. বিশ বছর পূর্ণ না হলে কেউ উপসম্পদা লাভ বা ভিক্ষু হতে পারে না। ২. ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করার জন্য নির্দিষ্ট কত গুলো শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সেগুলো না জানলে কেউ ভিক্ষু হতে পারে না। ৩. কমপক্ষে দশজন ভিক্ষু উপস্থিত না হলে ভিক্ষু হতে পারে না। ৪. ভিক্ষু সীমাঘর অথবা উদক সীমা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে ভিক্ষু হওয়া যায় না। ৫. ভিক্ষুদের ২২৭টি শীল পালন করতে হয়। ৬. ভিক্ষুদের প্রতিদিন আপত্তি দেশনা করা কর্তব্য। ৭. ভিক্ষুদের হাতে খাবার উঠিয়ে না দিলে গ্রহণ করতে পারে না।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন হয়?

ক. ধর্মীয় উৎসব　　খ. সামাজিক উৎসব
গ. পূজার উৎসব　　ঘ. বিবাহ উৎসব

২. কোন প্রভাবে মানুষ দুঃখ মুক্তি লাভ করতে পারে?

ক. অর্থ প্রভাবে　　খ. মানুষের প্রভাবে
গ. পুণ্যের প্রভাবে　　ঘ. কর্মের প্রভাবে

৩. কিসের বলে ভব সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়?

ক. জন বলে　　খ. শ্রদ্ধার বলে
গ. মনো বলে　　ঘ. পূজার বলে

৪. সংঘদান উপলক্ষে কমপক্ষে কয়জন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে হয়?

ক. ৪ জন　　খ. ৫ জন
গ. ৬ জন　　ঘ. ৭ জন

৫. কাকে দশশীল পালন করতে হয়?

ক. শ্রমণকে　　খ. ভিক্ষুকে
গ. উপাসক–উপাসিকাকে　　ঘ. বালক–বালিকাকে

৬. কোন দান বছরে একই বিহারে একবারের বেশি অনুষ্ঠিত হতে পারে না?

ক. কঠিন চীবর দান　　খ. অষ্টপরিষ্কার দান
গ. সংঘদান　　ঘ. পিণ্ডদান

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বৌদ্ধরা .... প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী।
২. বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে .... অন্যতম।
৩. ভিক্ষুদের আষাঢ়ী পূর্ণিমার .... গ্রহণ করতে হয়।
৪. শ্রমণদের জন্য দশ শীল এবং .... সেখিয়া ধর্ম রয়েছে।
৫. গৃহী বৌদ্ধদেরও .... তাৎপর্য উপলব্ধি করা উচিত।
৬. .... বছরের কম বয়সে উপসম্পদা লাভ করা যায় না।

২০২০

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. বৌদ্ধরা বুদ্ধের	১. মহাফল লাভ হয়।
২. বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব	২. কঠিন চীবর দানোৎসব হতে পারে না।
৩. সংঘদান করলে	৩. প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী।
৪. একই বিহারে বছরে একবারের বেশি	৪. অনুষ্ঠানের দ্বারা মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।
৫. ভিক্ষুদের ব্যবহার্য যেকোনো একটি	৫. চীবর দিয়ে কঠিন চীবর দানোৎসব করা যায়।
৬. ছেলে-মেয়েরা সারাদিন	৬. সীমাঘর প্রয়োজন হয়।
	৭. আনন্দ উৎসবে বিভোর থাকে।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. কী কর্মের দ্বারা মন হতে পাপ দূরীভূত হয়?
২. ভগবান বুদ্ধ কাকে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র বলেছেন?
৩. কোন পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুরা আপত্তি দেশনা করেন?
৪. ভিক্ষুদের কী মোচনের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত?
৫. একই বিহারে বছরে একবারের বেশি কোন উৎসব হতে পারে না?
৬. ‘পব্বজ্জা’ শব্দের অর্থ কী?
৭. শ্রমণেরা কয়টি সেখিয়া ধর্ম পালন করে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধরা কী কী ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে তার নাম উল্লেখ কর।
২. ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের সুফল কী বর্ণনা কর।
৩. সংঘদান অনুষ্ঠানের নিয়ম বর্ণনা কর।
৪. কঠিন চীবর দানের মনোজ্ঞ বর্ণনা দাও।
৫. ‘প্রব্রজ্যা’ শব্দের অর্থ কী? কীভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হয়?
৬. শ্রমণ ও উপসম্পদার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

২০২৫

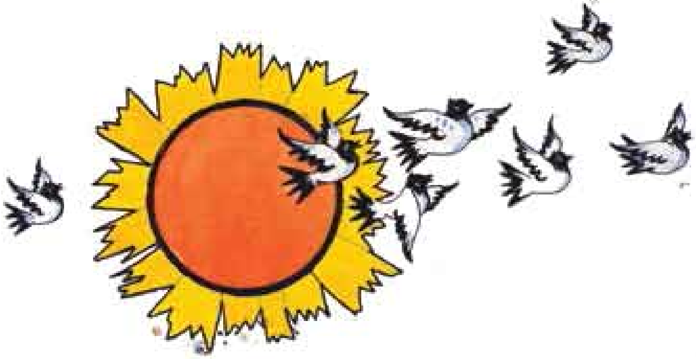

একাদশ অধ্যায়

ধর্ম ও স্বদেশপ্রেম

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একই সমাজে নানা জাতি গোষ্ঠী ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে পরস্পরের সহযোগী হয়ে বসবাস করে। সবাইকে নিয়েই সমাজ। মানবসমাজে থাকবে সামাজিক ঐক্য,সংহতি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন। একটি বনে বা বাগানে যেমন নানা জাতের বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, ফুল প্রভৃতি থাকে, তেমনি মানবসমাজও সে রকম। তাই একই সমাজে নানা জাতি–গোষ্ঠী ও ধর্ম–বর্ণের মানুষ না থাকলে সে সমাজ সুন্দর মনে হয় না।

প্রত্যেক পরিবারে যেমন নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে, তেমনি সমাজেও নিয়ম শৃঙ্খলা থাকবে। নিয়ম-কানুন ছাড়া মানুষ একত্রে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। যার যার খুশি মতো চললে সমাজ ও দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এজন্য প্রত্যেক ধর্মের উপদেশ হলো– ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং এর মাধ্যমে সমাজ ও দেশের উপকার সাধন করা।

সমাজ জীবনে দুই রকম নীতি প্রচলিত থাকে, একটি সাধারণ নীতি; অন্যটি ধর্মীয় নীতি। সাধারণ নীতিমালার মধ্যে থাকে সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা, দায়িত্ব-কর্তব্য ও সামাজিক রীতিনীতি। আর ধর্মীয় নীতির মধ্যে থাকে ধর্মীয় বিধি, আচার–অনুষ্ঠান ও পূজা–পার্বণের নিয়ম–নীতি প্রভৃতি।

দায়িত্ব কর্তব্য মানুষকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়। উন্নতির জন্য কোনো দেবতা কিংবা অলৌকিক শক্তি কাজ করে না। নিজের আপন শক্তিই যথেষ্ট। কারণ মানুষের আছে অনন্ত কর্মশক্তি। সেই শক্তি দিয়ে মানুষ তার আপন মনুষ্যত্বকে আলোকিত করতে পারে। মানুষ তার আত্মশক্তি দিয়েই বিশ্বের সব কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এজন্যই বৌদ্ধধর্মে মানুষের কর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে জননী ও জন্মভূমির সাথে মানুষের রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বৌদ্ধধর্ম মতে, দেশের গৌরবকে সমুন্নত রাখা একজন সুনাগরিকের পবিত্র কর্তব্য।

একটি শত্রুতা আরেকটি শত্রুতার জন্ম দেয়। একটি আঘাত আরেকটি প্রতিহিংসা তৈরি করে। অতএব এই সত্যনীতিকে ধারণ করে আমাদের মনের সকল প্রকার হিংসা,

২০২০

প্রতিহিংসা, অশুভ ভাবনা ও মন্দ চিন্তা দূর করতে হবে। সর্বদা সৎ ও কুশল কর্মে ব্রতী হতে হবে। সত্য ও ন্যায়পথে চলতে হবে। অপরের অনিষ্ট চিন্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। নিরাপদ সমাজ ও দেশ গড়ার জন্য চিন্তা করতে হবে।

ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড মানব জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনে অপরিহার্য। বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যেখানে বারবার বলা হয়েছে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার কথা। মানবতা ও মানবিক মূল্যবোধের কথা। তাই বৌদ্ধধর্মের সকল কর্ম ও সকল সাধনা শীলময়, সমাধিময় এবং প্রজ্ঞাময় সম্পর্কযুক্ত। প্রজ্ঞা ও শীল সম্প্রযুক্ত কর্মই কুশলকর্ম। কুশলকর্ম পাপাচার নিবারণ করে মানব জাতিকে ধর্মপালন ও ধর্মাচরণে উৎসাহিত করে।

অন্ধ ব্যক্তিকে বৌদ্ধ ভিক্ষু রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছেন

বুদ্ধ বলেন, ধর্ম হলো সদ্, সুন্দর এবং সম্যকভাবে জীবন যাপনের এক অঙ্গীকার। এজন্য বৌদ্ধধর্মে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি সম্যক পথের কথা স্বীকৃতি পেয়েছে। এ আটটি পথ হলো সদ্দৃষ্টি, সদ্কর্ম, সদ্বাক্য, সদ্জীবিকা, সদ্সংকল্প, সদ্প্রচেষ্টা, সদ্স্মৃতি ও সদ্সমাধি।

মানুষের সামাজিক জীবনে অনেক ধরনের দুঃখ ও চাহিদা থাকতে পারে। যেমন– ক্ষুধা, দরিদ্রতা, বিত্ত–বৈভব ও সম্পদ অর্জনের চিন্তা এবং নানা অভাব-অনটন প্রভৃতি। তাই বলে যে আমি চৌর্যবৃত্তি, দুর্নীতি বা অসদুপায় করে এগুলো মেটাব, সেটা তো হতে পারে না। এগুলো লাভের জন্য নিয়মনীতিও লঙ্ঘন করতে পারি না। ধর্মকে অবলম্বন করে আমরা নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড পালন করে থাকি। যেমন: পূজা–পার্বণ, বিভিন্ন জাতীয় উৎসব, মেলা, বিবাহ ইত্যাদি। ধর্মকে অবলম্বন করে বৌদ্ধরা ধর্মীয় ও সামাজিক নানা ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করে থাকে।

বৌদ্ধধর্ম একটি সর্বজনীন ধর্ম। সর্বজনীনতা মানে সম–অধিকার ও সমমর্যাদা। সব মানুষের কর্মশক্তির প্রতিফলন ও সামাজিক মূল্যায়নে বাকস্বাধীনতা, চিন্তা ও মননের স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা থাকতে হবে।

বুদ্ধের এ মুক্তিদর্শন আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পূর্ণতাসহ জাগতিক সর্বপ্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যতা এনে দেয়। বুদ্ধের প্রথম বাণী ছিল, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখ ও মঙ্গলের জন্য ধর্ম প্রচার করা। এ থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধধর্ম সর্বজনীন ও মানবতার ধর্ম। বুদ্ধের নীতিবাক্যগুলো বর্তমান সমাজজীবনে দেশপ্রেম ও মানবিক গুণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ নীতিবাক্যগুলোর মাধ্যমে মানবজীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়।

মানবতা এবং মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশই বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্ব। বৌদ্ধমতে, বিনয়, দয়া, সত্য, প্রেম, ভালোবাসা–এগুলো মানবিক গুণ। এসব গুণের মধ্যেই আদর্শ জীবনের মহিমা প্রকাশ পায়। এ চরিত্র গঠনের নিমিত্তেই বৌদ্ধধর্মে সব মানুষকে আপন সন্তানের মতো ভাববার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

জীবনকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে পর্যবসিত করতে হলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এবং দয়া, দান ও সেবার প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন হয় সমতা, ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণধর্মের। এগুলো একজন মানুষকে করুণাবান ও মৈত্রীবান হতে শেখায়।

বৌদ্ধরা মৈত্রীপরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা বুদ্ধের অহিংসানীতি, সংযম ও ঐক্য–সংহতির মন্ত্রে উজ্জীবিত। বৌদ্ধরা চিন্তা–চেতনায় ও নীতি লালনে এ নিয়ম অনুসরণ করে। তাই তাঁরা সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট শান্তিকামী মানুষ হিসেবে সমাদৃত এবং আদরণীয়।

নিজের দেশের সাথে বাইরের নানা দেশের সুসম্পর্ক রাখতে হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুসম্পর্কের প্রয়োজন বেশি। এতে বিভিন্ন দেশের সাথে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে। সকল ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায়। নানা ক্ষেত্রে উন্নতি–সমৃদ্ধির প্রভাবও বিস্তার লাভ করে।

দেশপ্রেম মানব জীবনের অপরিহার্য উপাদান। নিজের দেশকে ভালোবাসাই হলো স্বদেশপ্রেম। বৌদ্ধধর্ম নিজের দেশকে ভালোবাসতে শিক্ষা দান করে। তাই দেশপ্রেমে এগিয়ে আসা সকল মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশের কল্যাণে যে নিবেদিত নয়, সে দেশপ্রেমিক নন। দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মাঝেই নাগরিক জীবনের সার্থকতা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীতে যারা কর্মঠ ও উন্নত জাতি, তারা সকলেই নিজ দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসে। দেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করে। যেমন– চীন, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি। স্বদেশের উপকার ও কল্যাণের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থাকতে হবে। দেশের উন্নতি–সমৃদ্ধির জন্য নিরন্তর ভাবনা থাকতে হবে। দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসার মানবিক গুণ, শ্রম ও মর্যাদা দেখাতে হবে। এগুলোই হলো দেশপ্রেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বৌদ্ধরা

ন্যায়তন্ত্র হচ্ছে সব মানুষের সকল প্রকার ন্যায় অধিকার। অর্থাৎ একটি দেশে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকবে। এখানে কোনো প্রকার বৈষম্য থাকবে না। শ্রেণি স্বার্থ থাকবে না। বৈষয়িক স্বার্থ থাকবে না। এমনকি পদমর্যাদার স্বার্থও থাকবে না। ধর্মের বৈষম্যও এখানে বিচার করা হবে না। ধনী দরিদ্র এবং সব পেশার মানুষ

২০২০

এখানে হবে এক ও অভিন্ন। সব মানুষ তার নিজের মত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে। বুদ্ধের সময় বৃজি ও বৈশালীবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম ও ঐক্যসংহতির উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়।

আত্মমর্যাদা বলতে নিজের বা স্বীয় মর্যাদাকে বোঝায়। বৌদ্ধধর্মে আত্মমর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আত্মমর্যাদা যেকোনো ব্যক্তি ও জাতির জন্য মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে আসে।

স্বদেশপ্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ আত্মমর্যাদার অন্যতম গুণাবলি। সুন্দর সমাজ ও জীবন গঠনের জন্যে এ গুণগুলো অতীব প্রয়োজনীয়। মানব জীবনের সকল প্রকার কর্তব্য ও মঙ্গালের জন্য আত্মমর্যাদার গুণ প্রভাবিত হয়।

বুদ্ধ বলেছেন, বহুপ্রকার সত্য জ্ঞান লাভ করতে হবে। বহুবিধ শিল্প শিক্ষা করতে হবে। বিনয়ে সুশিক্ষিত হতে হবে। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

একটি সভ্য জাতির কাছে স্বাধীনতার চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। তাই বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ১৯৭১ এর স্বাধীনতাসংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ শুধু একখণ্ড ভূমির অধিকার পাবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম। এ ছাড়া অন্য জাতির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাওয়া। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ও জাতি গঠনের সুযোগ লাভ করাই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনা বাঙালি জাতির প্রেরণা রূপে কাজ করে যাবে যুগ যুগ ধরে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাঙালি শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে। ধর্মীয় কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে হাজার বছরের বাঙালির ঐক্য, সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করেছে। এতে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান একই পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। এ একতা নতুন দেশ গঠনে বাঙালিকে নতুন প্রেরণা দান করে।

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও উপজাতি বৌদ্ধরা অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেও বৌদ্ধদের অবদান ছিল। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও উপজাতি বৌদ্ধদের অসাধারণ অবদান নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। বৌদ্ধরা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে। ভারতের নানা স্থানে গিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এ ছাড়া বৌদ্ধরা এই মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দান করেছে। বিহার–প্যাগোডা ও ধর্মশালায় নিরীহ মানুষদের আশ্রয় দিয়েছে।

২০২০

খাদ্য ও বস্ত্র দিয়েছে। সাধারণ জনগণকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। দেশ-বিদেশে স্বাধীনতার পক্ষে অবদান রেখেছেন শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের, পণ্ডিত শান্তপদ মহাথের প্রমুখ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ। অন্যদিকে বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সূপতি রঞ্জন বড়ুয়া, সাধন বড়ুয়া, সুবাস বড়ুয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণ অন্যতম।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বলা যায় বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে।

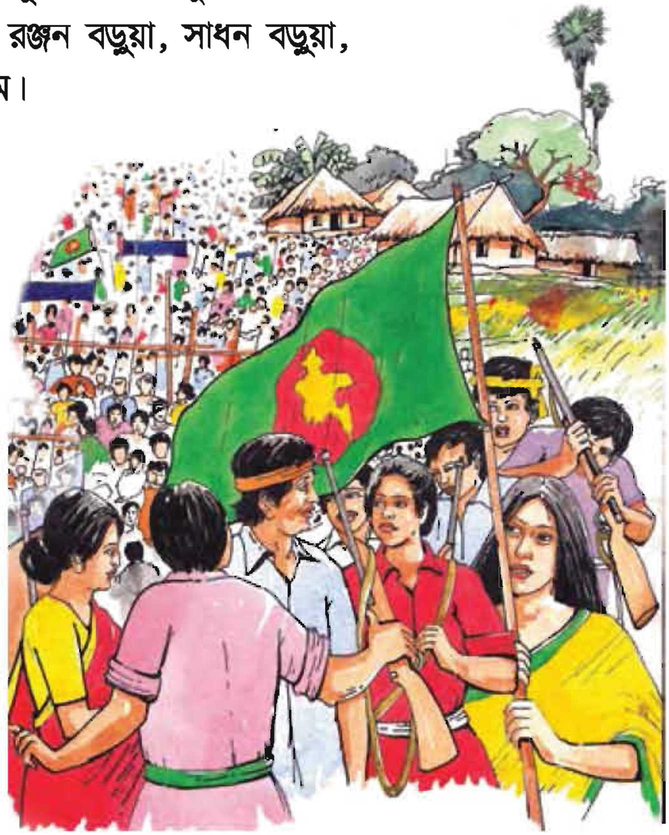

নানা ধর্ম–বর্ণের মানুষসহ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়–উল্লাস

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও :

১. মানব সমাজে কী থাকবে?

ক. ঐক্য–সংহতি
খ. ঝগড়া–বিবাদ
গ. পারস্পরিক অসহযোগিতা
ঘ. অসহনশীলতা

২. মানুষকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়–

ক. আলস্যতা খ. দায়িত্ব–কর্তব্য

গ. কর্মবিমুখতা ঘ. দায়িত্বহীনতা

৩. নিজের দেশের সাথে বাইরের নানা দেশের কী থাকবে?

ক. ঝগড়া-বিবাদ খ. মনোমালিন্য

গ. দুঃসম্পর্ক ঘ. সুসম্পর্ক

৪. সব মানুষ তাঁর নিজের মত প্রকাশ করতে পারবে–

ক. ভয়ে ভয়ে খ. হৈ চৈ করে

গ. স্বাধীনভাবে ঘ. পরাধীনভাবে

৫. বৌদ্ধধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–

ক. মানবতা ও মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ খ. সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যপূর্ণ আচরণ

গ. অগণতান্ত্রিক ও অন্যায্যতা ঘ. স্বাধীনতাহীন ও বিভেদপূর্ণ আচরণ

৬. মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধরা কী করেন?

ক. অসহযোগিতা করেন খ. শত্রুকে সাহায্য করেন

গ. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ঘ. স্বাধীনতাবিরোধী কাজ করেন

৭. নিজের এবং স্বীয় মর্যাদাকে কী বোঝায়?

ক. শ্রম মর্যাদা খ. জ্ঞান মর্যাদা

গ. আত্মমর্যাদা ঘ. ধর্ম মর্যাদা

খ। শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনে ....।

২. মানবতা এবং .... গুণাবলির বহিঃপ্রকাশই বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্ব।

৩. ন্যায়তন্ত্র হচ্ছে সব মানুষের সকল প্রকার ....।

৪. একটি সভ্য জাতির কাছে স্বাধীনতার চেয়ে .... আর কিছু নেই।

৫. বৌদ্ধরা .... বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে।

২০২০

৬. সর্বজনীনতা মানে সম-অধিকার ও ....।

৭. দেশপ্রেম মানব জীবনে .... উপাদান।

গ। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. নিরাপদ সমাজ ও দেশ গড়ার জন্য	১. অবদান নিঃসন্দেহে স্মরণীয়
২. স্বদেশপ্রেম, কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতাবোধ	২. দেশপ্রেম ও মানবিক গুণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
৩. মানুষের সামাজিক জীবনে	৩. অধিকার পাবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
৪. বুদ্ধের নীতিবাক্যগুলো বর্তমান সমাজ জীবনে	৪. মানব জীবনে অপরিহার্য।
৫. মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের	৫. অনেক ধরনের দুঃখ ও চাহিদা থাকতে পারে।
৬. দেশপ্রেম	৬. চিন্তা করতে হবে।
	৭. আত্মমর্যাদার অন্যতম গুণাবলি।

ঘ। নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ন্যায়তন্ত্র বলতে কী বোঝায়?
২. কতিপয় মানবিক গুণ সম্পর্কে লেখ।
৩. সর্বজনীনতা কী?
৪. আত্মমর্যাদা লাভের উপায় কী?
৫. দেশপ্রেম কাকে বলে?
৬. কয়েকজন বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার নাম উল্লেখ কর।

ঙ। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য বলতে কী বোঝায়?
২. আত্মমর্যাদা ও সর্বজনীনতা দেশ ও জাতির কী উপকার করে লেখ।
৩. মানবিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দাও।
৪. দেশপ্রেমের গুরুত্ব তুলে ধর।
৫. ধর্ম ও স্বদেশপ্রেমের মধ্যে সম্পর্কগুলো তুলে ধর।
৬. মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের ভূমিকা কী ছিল বর্ণনা কর।
৭. আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।

২০২০

দ্বাদশ অধ্যায়

পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস

যার সাহায্যে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলা হয়। ভৌগোলিক ভিত্তিতে ভাষা নানা প্রকার হয়, যেমন– সংস্কৃত , পালি, বাংলা, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি ইত্যাদি। গৌতম বুদ্ধ পালি ভাষাতে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মবাণী ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে এবং পালি ভাষাতে লেখা। সুতরাং ত্রিপিটকের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে পালি শব্দের অর্থ, উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পালি শব্দের অর্থ পাঠ, সারি, পঙ্ক্তি, বীথি বা শ্রেণি। পালি পাঠ সব সময় বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই যে ভাষায় বুদ্ধবাণী সংরক্ষিত হয়েছে সেটাই পালি। বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রাবস্তী, জেতবন, পূর্বারাম, বেণুবন, নালন্দা প্রভৃতি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সমস্ত বিহারে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ আছে। এ বিহারগুলোতে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারগুলোতে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকসমাগম ও ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হতো। এ বিহারগুলোতেই পালি ভাষার উৎপত্তি হয়। পালি ভাষার প্রাচীন নাম হচ্ছে মাগধী। বিশেষ করে উত্তর ভারতে প্রচলিত শব্দ সম্ভারে পালি ভাষা পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। পালি প্রথমে কথ্যভাষা ছিল, পরে সাহিত্যের ভাষায় রূপ নেয়।

ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি স্তর রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে–প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা ও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা। পালি মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্গত। এর উৎপত্তি কাল খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৮০০ শতক। কেউ কেউ মনে করেন, মাগধী বা মাগধী নিরুত্তি থেকে পালি ভাষার উৎপত্তি। আবার কারও কারও মতে, পশ্চিম ভারত কিংবা পূর্ব ভারতই পালির উৎপত্তিস্থল। এ সব অঞ্চলের ভাষা পালি ভাষার সাথে জড়িত। এক-সময় উত্তর ভারত মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এ সময় পালি ভাষা বা মাগধী ভাষা সমস্ত উত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল।

পালি ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পালি সংস্কৃতের চেয়ে সহজ ও শ্রুতিমধুর। বুদ্ধের সময়ে এ ভাষা কথ্য ভাষা ছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্য থেকে অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক ভাষায় প্রথমে কথা বলতেন। পরে সবারই বোধগম্য একটি সহজ সরল ভাষার সৃষ্টি হয়। এটাই পালি ভাষা। ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সাথে সমন্বয় সাধনের ফলে এ ভাষা জনসাধারণের অনুধাবনের জন্য সহজতর হয়। বাংলা ভাষার সাথে পালি ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এ ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য।

পালি ভাষার অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা একচল্লিশ। তন্মধ্যে আটটি স্বরবর্ণ এবং তেত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ

যে সমস্ত বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাদেরকে স্বরবর্ণ বলে। পালিতে স্বরবর্ণ আটটি:

অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও

তন্মধ্যে অ ই উ– এ তিনটি হ্রস্ব স্বর এবং আ ঈ ঊ এ ও – এ পাঁচটি দীর্ঘস্বর।

ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সমস্ত বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না, তাদেরকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।
পালিতে ব্যঞ্জনবর্ণ তেত্রিশটি :

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ৰ স
হ ল় ং

তন্মধ্যে প্রথম পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ পাঁচ বর্গে বিভক্ত:

ক খ গ ঘ ঙ – এ পাঁচটি ক বর্গ
চ ছ জ ঝ ঞ – এ পাঁচটি চ বর্গ
ট ঠ ড ঢ ণ – এ পাঁচটি ট বর্গ বর্গের প্রথম অক্ষর অনুসারে
ত থ দ ধ ন – এ পাঁচটি ত বর্গ বর্গের নামকরণ হয়।
প ফ ব ভ ম – এ পাঁচটি প বর্গ

ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না। বর্গসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে অঘোষ বর্ণ বলে। বর্গসমূহের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ – এদেরকে ঘোষ বর্ণ বলে।

ং (অং)– এ বর্ণটিকে নিগ্রহিত (নিগ্‌গহীত) বলে।

এ ছাড়া বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণকে অল্পপ্রাণ বলে।

বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ বলা হয়।

অর্থাৎ অল্পপ্রাণ বলতে আস্তে এবং মহাপ্রাণ বলতে জোরে উচ্চারণ করতে হয়।

আবার উচ্চারণ স্থান হিসেবে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা , দন্ত বলা হয়।

যেমন– ক খ গ ঘ ঙ অ আ হ – এগুলো উচ্চারণ করলে কণ্ঠে আওয়াজ হয়।
তদ্রূপ–

চ ছ জ ঝ ঞ হ ই ঈ – কণ্ঠবর্ণ
ণ ফ ব ভ ম উ ঊ – ওষ্ঠ বর্ণ
ট ঠ ড ঢ ণ র ল – মূর্ধা বর্ণ
ত থ দ ধ ন ল স – দন্ত বর্ণ

অক্ষর উচ্চারণের ক্ষেত্রে কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মূর্ধা এবং দন্ত কাজ করে।

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় স্বরের সংখ্যা বেশি। কিন্তু পালি ৮টি স্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তোমরা মনে রাখবে, বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের ঋ, ৯, ঐ, ঔ– এ চারটি অক্ষর পালি

ভাষায় নেই। আর ব্যঞ্জনবর্ণের শ, ষ, স –এ তিনটির মধ্যে শুধু 'স' এর ব্যবহার আছে। ড়, ঢ়–এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। এ ছাড়া পালিতে ´ (রেফ), ঃ (বিসর্গ), ৃ (ঋ–ফলা) নেই।

এ সম্পর্কে তোমাদের পুরো ধারণা থাকলে পালি শব্দ গঠন সহজতর হবে। পালির সংগে বাংলার সম্পর্ক বেশি। কারণ, বাংলা ভাষার উৎপত্তি পালি ভাষা থেকেই। চর্যাপদের ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষার আদি।

তোমাদের সুবিধার জন্য নিম্নে পালি ও বাংলা শব্দের একই রূপের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

পালি	বাংলা
অঞ্জলি	অঞ্জলি
সঞ্চয়	সঞ্চয়
কণ্টক	কণ্টক
পণ্য	পণ্য
উত্তম	উত্তম
উত্তর	উত্তর
আহার	আহার
বুদ্ধি	বুদ্ধি
স্বাগত	স্বাগত
কুঠার	কুঠার
কোকিল	কোকিল
কল্যাণ	কল্যাণ

তোমাদের বর্তমান পাঠ্যপুস্তক 'বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের বন্দনা, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা, চতুর্থ অধ্যায়ের দশশীল পালিতে লেখা আছে। তোমরা লক্ষ্য করবে, পালি উদ্ধৃতির কোথাও ঋ, ৃ, ৯, ঐ, ঔ, ´(রেফ), ঃ (বিসর্গ) নেই।

সুতরাং দেখা যায়, ভাষার দিক দিয়ে পালির বেশ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পালির শব্দগত বৈশিষ্ট্য সহজে অনুমান করা যায়। শুধু ধাতুরূপ, শব্দরূপ, কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত পার্থক্য আছে। তবে অন্যান্য ভাষার চেয়ে অনেকটা সহজ।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. ভারতীয় আর্য ভাষার কয়টি স্তর আছে?

ক. দুটি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি

২. পালি কোন আর্য ভাষার অন্তর্গত?

ক. মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা
খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা
গ. নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা
ঘ. ভারতীয় দ্রাবিড় ভাষা

৩. বুদ্ধের ধর্মবাণী কোথায় লিপিবদ্ধ আছে?

ক. গীতায়
খ. বাইবেলে
গ. ত্রিপিটকে
ঘ. বৈদিক শাস্ত্রে

৪. উত্তর ভারত কোন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

ক. মগধ
খ. বিহার
গ. পাঞ্জাব
ঘ. কোশল

৫. পালিতে স্বরবর্ণ কয়টি?

ক. ১১টি
খ. ১০টি
গ. ৮টি
ঘ. ৭টি

৬. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন কোনটি?

ক. প্রাকৃত
খ. অর্ধ মাগধী
গ. অপভ্রংশ
ঘ. চর্যাপদ

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. এ সমস্ত বিহারে বিভিন্ন .... সংমিশ্রণ আছে।
২. যে ভাষায় বুদ্ধবাণী .... হয়েছে সেটাই পালি।
৩. একসময় উত্তর ভারত .... সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০২০

৪. এ বিহারগুলোতে পালি ভাষার .... হয়।
৫. পালি প্রথমে কথ্যভাষা ছিল, পরে .... ভাষার রূপ নেয়।
৬. বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে .... বলা হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. তাঁর প্রচারিত ধর্মবাণী	১. বাংলার সম্পর্ক পালির বেশি।
২. এ সমস্ত বিহারে বিভিন্ন	২. ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
৩. এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের চেয়ে	৩. এ পাঁচটি দীর্ঘস্বর।
৪. এসব অঞ্চলের ভাষা পালির সাথে	৪. স্বরের সংখ্যা বেশি।
৫. আ ঈ ঊ এ ও–	৫. ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে।
৬. সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায়	৬. জাতির সংমিশ্রণ আছে।
	৭. উচ্চারণে কোনো প্রভেদ নেই।

ঘ. নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি স্তর কী কী?
২. প্রাচীন ভারতের চারটি বৌদ্ধ বিহারের নাম লেখ।
৩. পালি ভাষায় অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা কত?
৪. পালি স্বরবর্ণে কোন বর্ণগুলো ব্যবহার হয় না?
৫. অল্পপ্রাণ বলতে কী বোঝ?
৬. পালিতে ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পালি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে লেখ।
২. পালি বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
৩. পালিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি ও কী কী?
৪. প্রথম পঁচিশটি পালি বর্ণের পাঁচটি বিভক্তকরণ দেখাও।
৫. পালি ও বাংলা শব্দের একই রূপের বারোটি শব্দের একটি তালিকা তৈরি কর।
৬. পালি বর্ণমালা সম্পর্কে একটি ধারণা দাও।

সমাপ্ত

২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৫ম-বৌদ্ধধর্ম

বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

-জাতক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য